বাংলাদেশের জনজীবন ও পরিবেশে

কুতথ্যের কথকতা

বাংলাদেশে জনজীবন ও পরিবেশে কুতথ্যের কথকতা
সিয়াম সারোয়ার জামিল

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশক
ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)
১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : +৮৮ ০২ ৪১০২২৫০৯, ৪১০২২৫১০
ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.iedbd.org

মূল্য
১০০ টাকা

মুদ্রক
কারপাস
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৪৬১২০৯৩, ০১৭১২৭৭০০৪২
ই-মেইল : carpasmcbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.carpasmc.com

Bangladeshe janojibon o poribeshe kutothyer kathokota
A book on disinformation in the life and environment of Bangladesh.

Published by
Institute for Environment and Development (IED), Dhaka, 2021

প্রসঙ্গকথা

মানুষের মনোগঠন পরিবর্তন করে সমাজ রূপান্তরের জন্য কাজ করে আইইডি। নারী, যুব, জাতিগত-ধর্মীয় সংখ্যাল্প মানুষের অধিকার, পরিবেশের উন্নয়ন এবং 'জনউদ্যোগ'-এর মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ সামাজিক জাগরণে সংগঠিত করতে সংস্থা সহযোগিতা করে।

বর্তমান ভার্চুয়াল সমাজে তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্ব ও নানামাত্রিক প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্ক ও তথ্যবিনিময়ের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। প্রায় দশ কোটি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে ও প্রায় চার কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সঠিকভাবে ব্যবহারে আমাদের মনোজগতের পরিবর্তন ও সক্ষমতা জরুরি।

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এদেশে আমরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম-স্তর-লিঙ্গের মানুষ সমাজে মিলেমিশে বাস করি। বহুত্ববাদী সমাজে এটি আমাদের সম্পদ। কিন্তু অনেক সময় নিয়মানুযায়ী ও সঠিকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করে অনলাইনে কুতথ্য ছড়িয়ে সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট ও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। ফলে বিভিন্ন স্থানে অযাচিত বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা; কুতথ্য না ছড়ানো ও প্রয়োজনে প্রতিহত করা; সমাজে চিরায়ত সম্প্রীতি রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে জানা বোঝা দরকার। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেওয়া; সুশাসন এবং সকলের সমমর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা জরুরি। আমরা মনে করি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য প্রতিরোধে সচেতনতা ও সক্ষমতা অর্জন এবং দায়িত্বশীল চর্চা করে সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের নারী, হিজড়া, ধর্মীয় সংখ্যাল্প ও জনজাতির জীবন এবং পরিবেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো কুতথ্যের বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। প্রথাগত নাগরিক সমাজসদস্যসহ সকলকে এ কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও দায়িত্বশীল করতে আইইডি এই বইটি প্রকাশ করছে।

বইটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন আমাদের সহকারী সমন্বয়কারী সিয়াম সারোয়ার জামিল। তাকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার। এ ছাড়া আরো যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

নুমান আহম্মদ খান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

ডিজিটাল কুতথ্য	৭
আগে কি কুতথ্য ছিল না	৯
কুতথ্যের কারণে পাল্টাচ্ছে অনেক কিছু	৯
ভুলতথ্য	১১
কূটতথ্য .	১২
ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য	১৪
ডিপ ফেইক	১৪
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম	১৫
অনলাইনে কুতথ্য চিহ্নিতকরণ	১৬
কুতথ্যের অর্থনীতি	১৭
কুতথ্যের মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব	২৪
নির্ভরযোগ্য উৎস যাচাই	২৭
নাগরিক সমাজ	৩৪
প্রথাগত সুশীল সমাজ	৩৪
অপসংস্কৃতি	৩৭
বাংলাদেশে উৎসব	৩৮
আমি, আমরা এবং ওরা	৪৫
কুতথ্য প্রচার শুরু হলে কী করবেন	৪৮
ধর্মনিরপেক্ষতা	৫০
কুতথ্য প্রচারকারীরা কী করে	৫০
জেন্ডার	৫১
জেন্ডার সংবেদনশীলতা	৫১
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেন নারী প্রধান টার্গেট	৫৫
গল্পগুজবের সাংবাদিকতা	৫৭
অনিশ্চিত পরিস্থিতি উদ্বেগে কুতথ্য ছোটে দ্রুতবেগে	৫৯
তথ্য ও খবর সঠিক কিনা বুঝব কীভাবে	৬১
কুতথ্যের শিকার হিজড়ারা	৬৪

সাক্ষাৎকার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৭৩
শাহদীন মালিক	৭৬
ড. শান্তনু মজুমদার	৭৮
শাহরিয়ার অনির্বান	৮৩
তথ্যসূত্র	৯২

ডিজিটাল কুতথ্য

ডিজিটাল কুতথ্য বলতে আমরা বুঝবো ইন্টারনেটে প্রদত্ত এমন সব খবরাখবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ডাটা, ইমেজ, ভিডিও, ফুটেজ বা এজাতীয় কিছু যেগুলো মিথ্যা, জালিয়াতিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর। ইউনেস্কোর (UNESCO) মতে "কোনো একজন ব্যক্তি, সামাজিক গ্রুপ, সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করার জন্য" Digital disinformation (ডিডি) তৈরি করা হয়। ডিডির মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাশিলের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

অনলাইনে কুতথ্য ভীষণ বিপজ্জনক। কারণ অনেক সময় খুব গুছিয়ে, যথেষ্ঠ মাত্রায় অর্থ ব্যয় করে এবং অটোমেটেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিডিকে শক্তিশালী করে তোলা হয় এবং অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

কুতথ্যের ফলে সমাজ-রাষ্ট্রে মেরুকরণ বেড়ে যেতে পারে। একটি গোষ্ঠীর সকল সদস্যকে একটি বৈচিত্র্যহীন বাঁধাধরা ছকে ফেলা দেয়া হতে পারে। এছাড়া কুতথ্যের দৌরাত্ম্যে কেবল একটি বর্ণ বা কেবলমাত্র একটি ধর্ম বা কেবলমাত্র লিঙ্গীয় পরিচয় বা কেবল একটি দল বা অন্য যে কোন একটি মাত্র আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে "আমরা" এবং "ওরা"র ধারণা শেকড় গেড়ে বসতে পারে।

যেমন, ভারতে একটি গোষ্ঠী গরুর মাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে মেরুকরণের রাজনীতি করছে। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় গরুর মাংস খায় না বলে, অন্যরা, সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিমরা গরুর মাংস খেতে পারবে না বলে তারা দাবি করছে। এর মধ্য দিয়ে এই গোষ্ঠীটি ধর্মেরভিত্তিতে মেরুকরণ করছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে "আলাদা" বা "ভিন্ন" হিসেবে চিহ্নিত করে দিচ্ছে। এই "আলাদা" বা "ভিন্ন" হবার কারণে মুসলিমদের উপরে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। শুধু তাই নয় গরুর মাংস খাওয়ার "অপরাধে" মুসলিমদের উপরে নির্যাতন চালানোর নায্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। গরুর মাংস ঘিরে অপপ্রচার ও প্রচারণার বড় একটি অংশ ঘটছে ইন্টারনেট জগতে।

আবার, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে "মূলধারা" ও "অভিবাসী" এই ভেদ টানার মধ্য দিয়ে মেরুকরণ, সকল অভিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে এক ছকে ফেলা এবং মূলধারাকে "আমরা" এবং অভিবাসীদের "ওরা" হিসাবে পরিচিত করানোর জোর চেষ্টা দেখা যায় সামাজিক মাধ্যমে। এই প্রচারণার মধ্য দিয়ে কোন কোন দেশে অভিবাসী-বিদ্বেষী রাজনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

অভিবাসী-বিদ্বেষের মধ্যে অনেক সময় আবার সরাসরি বা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বর্ণ-বিদ্বেষ ও ধর্ম-বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায় যা ইন্টারনেটের বদৌলতে নিমেষের মধ্যে পৌঁছে যায় অসংখ্য মানুষের কাছে।

অনেক সময় ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ইমেজ বাড়ানো বা বিরোধীদের হেনস্থার জন্য ডিডি'র আশ্রয় নেয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কখনো কখনো কোন-কোন সরকার/রাষ্ট্র ডিডি'র আশ্রয় নিতে পারে। পক্ষান্তরে, অগণতান্ত্রিক দল বা দলসমূহ (অবৈধভাবে গঠিত, যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী, উগ্রবাদী, মৌলবাদী ও অন্যান্য) কর্তৃক ক্ষমতাসীনদের কালিমালিপ্ত করা এবং জনগণের সমর্থন লাভের জন্যও কুতথ্য ব্যবহার করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্যযোগ্য একটি বিষয় এই যে, কুতথ্য কেবল আন্তঃগোষ্ঠী অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীর সাথে আরেকটি গোষ্ঠীর নয়, বরং আন্তঃগোষ্ঠী অর্থাৎ এক গোষ্ঠীর ভেতরে বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যেও বিভাজন প্রকট করতে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেটে এমন অজস্র লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি, অডিও-ভিডিও পাওয়া যায় যেগুলোতে একই ধর্মের দুটি ধারার মধ্যে একটি অপরটির বিরুদ্ধে বা পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বা ঘৃণা ছড়ায়। অনলাইন কুতথ্যের কারণে মানুষজনের মধ্যে একটিমাত্র আত্ম-পরিচয় বা একটিমাত্র পক্ষভিত্তিক মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। এধরণের পরিস্থিতিকে কোনভাবেই সুস্থ-স্বাভাবিক বলা চলে না।

কেননা মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হবার কথা সম্প্রীতির। রাষ্ট্র হবার কথা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। জাতিতে-জাতিতে সৌহার্দ্য হচ্ছে কাম্য এবং যৌক্তিক। কিন্তু ডিডি'র প্রাদুর্ভাবে অনেক জায়গাতেই বিশ্বের অনেক স্থানেই সম্প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডিডি'র প্রভাবে বহু মানুষের মধ্যে সমাজে ও রাষ্ট্রে শুধু মাত্র নিজ-জাতি, নিজ-বর্ণ, নিজ-ধর্ম, নিজ ধর্মের মধ্যে নিজ-ধারার আলোকে সব কিছুকে বিচার করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এছাড়াও নিজ-মূল্যবোধের আলোকে ভালো-মন্দ বিচারের প্রবণতা বেড়ে চলেছে।

এভাবে চলতে থাকার কারণে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয়-জাতিগত-বর্ণগতসহ সকল ধরনের সংখ্যালঘুরা ক্রমশ নিরাপত্তাহীন ও প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়,

বিদ্যমান বাস্তবতার কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক সমাজেই সংখ্যালঘুরা নিজদের মধ্যে খোলস-বন্দী হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মূলধারার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এই প্রবণতা জাতীয় সংহতির জন্য হুমকি। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকারক।

আগে কি কুতথ্য ছিল না?

একটি প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসবে। প্রশ্নটি হচ্ছে : আগে কি তথাকথিত "অন্যদের" ক্ষতি করার জন্য সমাজে কুতথ্য ছিলো না? আগে কি মিথ্যা, জালিয়াতিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর খবরাখবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও ছিলো না? উত্তর হচ্ছে, খুব ভালোভাবেই ছিলো। তাহলে ডিডি বা ডিজিটাল কুতথ্য নিয়ে এত আশঙ্কা কেন?

ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমে আসা এবং স্মার্টফোনের দাম কমে যাওয়ার মত বাস্তবতায় ডিজইনফরমেশন বা কুতথ্য আক্ষরিক অর্থে সর্বজনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া, আগেকার মাধ্যমগুলোর (প্রকাশনা, পত্রিকা, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি) তুলনায় ইন্টারনেট সাশ্রয়ী ও সর্বত্রগামী। ইন্টারনেটে আপলোড হওয়া তথ্য দেশের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে চলে যেতে পারে।

এই নতুন বাস্তবতায় (New Normal) একদিকে, কুতথ্য উৎপাদনকারী পক্ষগুলি খুব সহজে কুতথ্যের ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কুতথ্যের ভোক্তারা ইন্টারনেটে অবলীলায় নিজেদের চাহিদামাফিক কুতথ্য পেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে তার মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে কুতথ্য এসে হাজির হচ্ছে। অনেক সাধারণ মানুষ এর ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। মানুষে-মানুষে সম্প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন, কল্পিত বা জোর করে তৈরি করা "অপর" বা "শত্রু" তৈরি হচ্ছে। এই ভিত্তিহীন, কল্পিত বা জোর করে তৈরি করা "অপর" বা "শত্রু"র বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রবণতা হয়ে উঠেছে ডিজিটাল/ইন্টারনেট জগতের ভয়াবহ এক বাস্তবতা।

কুতথ্যের কারণে পাল্টাচ্ছে অনেক কিছু

ডিডি'র দৌরাত্ম্যে অনেক সমাজে মানবিকতা, যুক্তিশীলতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সহনশীলতা ও বহুত্ববাদিতার বিপরীতে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতাপ্রবণ একরোখা এক জীবনধারা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে কুতথ্য ব্যবহার করে থাকে। কুতথ্যের পরিসর এতটাই বেড়ে গেছে যে, আজকাল এক দেশের নির্বাচনকে

প্রভাবিত করার জন্য অন্য দেশ কর্তৃক ডিডি বা ডিজিটাল কুতথ্যের আশ্রয় নেয়ার কথাবার্তা শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়া কর্তৃক ডিডি ব্যবহারের অভিযোগ খুব জোরেশোরে শোনা গিয়েছিল। ২০২০ সালের নির্বাচনেও একই ধরণের হস্তক্ষেপের কথা অনেক দিন থেকে আলোচিত হয়েছে। এ ধরনের ডিডি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোটারদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে গভীর ভেদাভেদ তৈরি করা, কোনো একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে হেয় করা ও লোকজনকে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথ্যের মান যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে হয়তো সংবিধিবদ্ধ সতর্কতা দেয়া থাকে। কিন্তু এসব সতর্কতা অমান্য করলে ব্যবস্থা নেয়ার খবর খুব কম পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, খুব বড় ধরনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী না হলে কুতথ্যগুলো বিনা বাধায় ইন্টারনেটে বিচরণ করতে থাকে।

অসচেতন লোকজন না বুঝে এসব তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, প্ররোচিত হয়, সর্বোপরি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফেসবুক, ইউটিউব এর মতো মাধ্যমগুলোতে অসংখ্য কুতথ্যের বিচরণ থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়।বোধের ঘাটতি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও নানাবিধ কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিডি বা ডিজিটাল কুতথ্যের প্রভাব ভয়াবহ। ইন্টারনেটে ভেসে আসা যে কোন তথ্যকে নির্বিচারে গ্রহণ বা বিশ্বাস করার ফলে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক বা মতাদর্শিক স্বার্থের কারণে বহু মানুষ ও সংগঠন সচেতনভাবেই ডিডি উৎপাদন ও ব্যবহার করে চলেছে।

কুতথ্য বিস্তারের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে ইন্টারনেটে প্রাপ্ত যেকোন কিছুকে বিনা যাচাই-বাছাইয়ে সত্য ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া দেখানো।

ডিডি ভালোভাবে বুঝতে হলে আরো কয়েকটি শব্দ ও টার্মের সঙ্গে আমাদের একটু পরিচিত হয়ে থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশ, সমাজ, রাজনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি বোঝার জন্য এই শব্দ ও টার্মগুলো জরুরি। এগুলোর ব্যাপারে মোটামুটি অবগত থাকলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে অবগত থেকে একটি সম্প্রীতিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করা সম্ভব।

শব্দ ও টার্মগুলো হচ্ছে : Misinfrmation/ মিসইনফরমেশন = বেঠিক/ভুল তথ্য, Mal-information/ম্যালইনফরমেশন = কূটতথ্য, Hate Speech/ হেইট স্পিচ = ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য, Deepfake (ডিপফেইক)

ভুল তথ্য বা বেঠিক তথ্য (Misinformation)

ভুল তথ্য (Misinformation) হচ্ছে সেই অসত্য তথ্য যা লোকে সাধারণত অন্যকে বিভ্রান্ত বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছাড়াই ছড়ায়। তবে কারো কারো মতে, বেঠিক তথ্যের মধ্যে কখনো কখনো বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। আবার বেঠিক তথ্য কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ হতে পারে। বেঠিক তথ্যের ক্ষেত্রে আবার এমন হতে পারে যে, যিনি তথ্যটি প্রচার করছেন তিনি একে সঠিক মনে করছেন। যেমন, একজন ব্যক্তি কোথাও শুনেছেন যে, মোজার ভেতরে

রসুন ঢুকিয়ে পায়ে জুতো পরলে ঠান্ডা লাগা কমে যায়। লক্ষ করা দরকার, এ তথ্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আবার এ তথ্য বিশ্বাস করলেও তেমন কোন ক্ষতির কারণ নেই।

আবার, বেঠিক তথ্য দ্বারা আমরা এমন তথ্যকে বুঝতে পারি যা সচেতন বা অসচেতনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ছড়ানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি বলেন যে, তিনি সুন্দরবনের ভেতরে লঞ্চযোগে ভ্রমণকালে একাধিক জায়গায় সিংহ দেখতে পেয়েছেন।

হতে পারে, এই ব্যক্তি দূর থেকে অন্য প্রাণী দেখে সিংহ মনে করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি আদৌ কোন সিংহ দেখেন নি, অন্যদের কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহিরের জন্য তিনি সুন্দরবনে সিংহের কথা বলছেন। যারা সুন্দরবন সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা রাখেন তারা এই তথ্যে বিভ্রান্ত হবেনা না। কেননা তারা জানেন যে সুন্দরবনে সিংহ থাকেনা। কিন্তু যারা সুন্দরবন নিয়ে কিছু জানেন না তারা এতথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন। আবার, কোন একটি গ্রামে কোন একটি বাড়ির পুকুরে গুপ্তধন থাকার মত বেঠিক তথ্য ছড়ানো হলে তা উক্ত গ্রাম ও বাড়ির জন্য বড় ধরণের বিপদের কারণ হতে পারে।

কেননা গুপ্তধনের খবরে আকৃষ্ট হয়ে অপরাধীচক্র তৎপর হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও এলাকা বা অঞ্চলবাসী অধিক উৎসাহী হয়ে উক্ত বাড়িটির দিকে দলে দলে রওয়ানা হতে পারে। অর্থাৎ বেঠিক তথ্যটির কারণে উক্ত গ্রাম বা বাড়িটির নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

বেঠিক তথ্য (Misinformation)। এটি এমন একটি তথ্য যা মিথ্যা, তবে তা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে ক্ষতি করার জন্য তৈরি করা হয়নি। অনেকসময় বিখ্যাত তারকারাও এই ভুলটি করতে পারেন। কোভিড-১৯ যখন ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে তখন গুজব উঠে আসে যে, ফাইভ-জি [মোবাইল] এই ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই তথ্যটি বিশিষ্ট সেলিব্রেটিদের দ্বারা শেয়ার করা হয়েছিল, যারা নিজেরা বুঝতে পারেন নি যে, এটি আসলে একটি বেঠিক তথ্য। নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানীরা মানবদেহের উপর ফাইভ-জি মোবাইলের এর কোন প্রভাব না থাকার কথা উল্লেখ করে গুজবটি উড়িয়ে দিয়েছেন।

কূটতথ্য (Mal-information)

কূটতথ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে, এমন তথ্য যার সত্যতা রয়েছে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে খারাপ উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তথ্যটি সত্য হলেও, বিশেষ একটি সময় বা বিশেষ

কোন স্থানে এ তথ্যটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোন একজন ব্যক্তি, কোন একটি সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করতে পারে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলিকে মাথা কেটে হত্যা করে আইএস। হত্যাকাণ্ডের ফটো অনলাইনের বদৌলতে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা দুনিয়াজুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়। এখন ধরা যাক, পশ্চিমা দুনিয়ার কোন দেশে মুসলিম সম্প্রদায়কে পরিচিত করানোর জন্য যদি কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বয়ান ছাড়া কোন গ্রুপ জেমস ফলির হত্যাকাণ্ডের ছবি দেখায় তাহলে কি বুঝতে হবে। এভাবে কোন ধরণের ব্যাখ্যা ছাড়া ছবিটি প্রচার করার অর্থ হবে, মুসলমান মাত্র আইএস এর মত এরকম একটি ধারণা, যা সত্য নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঘটনাটি সত্য, ফটোটি সত্য হলেও ব্যবহারের ধরণের উপরে নির্ভর করে এই ফটো ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি কূটতথ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে।

অনুমতিহীনভাবে একজন ব্যক্তির গোপন বা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও বা ফটো অনলাইনে দিয়ে দেওয়া, সরকারি গোপন দলিল ফাঁস করে দেওয়া কিংবা ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়াকে কূটতথ্য প্রচার হিসাবে দেখা যায়।

এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে

২০১৭ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় রাউন্ড ভোটের ঠিক আগে-আগে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ইমানুয়েল মাঁখোর ব্যক্তিগত ইমেইল অজ্ঞাতপরিচয় সূত্র থেকে ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেয়া হয়। ইমেইলে বিষয়বস্তু সত্য হলেও, এটা বোঝা যাচ্ছিলো যে মাঁখোকে ভোটারদের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল ইমেইল ফাঁসের আসল উদ্দেশ্য। মাঁখো নির্বাচনে জয়ী হলেও, এই ঘটনাটি কূটতথ্য বা ম্যাল-ইনফরমেশন ব্যবহারের একটি বড় নজীর হিসেবে থেকে যায়।

প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে অনেক ধরনের তথ্য পেয়ে থাকি। তবে আমরা প্রাপ্ত এই তথ্যগুলি ব্যবহার করছি তা বিশ্বাসযোগ্য বা সঠিক আমরা কিভাবে নিশ্চিত করব? কুতথ্য এমন ধরনের তথ্য যা কিনা মিথ্যা এবং যে তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও ব্যক্তি, কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা কোনো সংস্থা বা দেশের ক্ষতি করার জন্য তৈরি করা হয়। কুতথ্যের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল এই মিথ্যা দাবি যে, করোনা ভাইরাস চীনের উহানের একটি পরীক্ষাগারে তৈরি হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই কুতথ্য, কারণ কোভিড-১৯ ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস সাধনের মনোভাব থেকে চীনে

তৈরি হওয়ার এই তথ্যটি অসত্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ্যেই জানিয়েছে যে, রোগটির উদ্ভবের কারণ এমন কোন কিছু নয়। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা তথ্যটি প্রচার করেছেন তিনিও ব্যাপারটা জানতেন, মূলত জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা প্রচার করেছেন।

কোন সঠিক তথ্য কারো ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তা কূটতথ্য। প্রায়শ ব্যক্তিগত তথ্য, গোপন ও ব্যক্তিগত ছবি, জনসাধারণ্যে উন্মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে এটি হয়। শুধুমাত্র শব্দ-বাক্য নয়, এই তথ্য ভিডিও বা ছবিও হতে পারে। অনলাইন এরকম তথ্য চোখে পড়লে অবশ্যই তা রিপোর্ট করতে হয়। এগুলো কখনো কারও সাথে শেয়ার করা উচিত না।

ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য (Hate Speech)

ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য (Hate Speech) বলতে বোঝায় এমন ধরনের কথা, লেখা বা আচরণ যা একজন ব্যক্তি বা একটি গ্রুপকে তিনি কে বা তারা কে এই বিবেচনার ভিত্তিতে বা অন্যভাবে বললে ধর্ম, জাতিসত্তা, জাতীয়তা, জাতি, বর্ণ, বংশ, লিঙ্গ বা অন্যান্য আত্মপরিচয়ের উপাদানের ভিত্তিতে মর্যাদাহানিকর বা বৈষম্যমূলকভাবে আক্রমণ করে।

এটা প্রায়শই অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন করে। নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এটি অবমাননাকর এবং বিভেদ সৃষ্টিকারক হতে পারে। মোট কথা, বর্ণ, ধর্ম, চামড়ার রঙ, যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, জাতি, অক্ষমতা বা জাতিগত মূলের ভিত্তিতে কোন একটি গোষ্ঠীর বা একটি শ্রেণির ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা, অবমাননা বা ঘৃণা জাগ্রত করার যেকোন ধরনকে ঘণা ছড়ানো বক্তব্য হিসেবে ধরা হয়।

ঘৃণ্য বক্তব্য একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে ঘৃণা, সহিংসতা এবং বৈষম্য ছড়ায়, প্ররোচিত করে, উত্তেজিত করে অথবা সমর্থন করে। ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য নিজের মতো করে চিত্রিত করে নেয়া "অন্যদের" বিরুদ্ধে ঘৃণা জ্ঞাপন, সহিংসতা এবং বৈষম্যকে নায্যতা দেয়। ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্যদানকারীরা নিজেদের মত বা বিশ্বাসকে একমাত্র "মত" বা "বিশ্বাস" হিসেবে দেখতে চায়। আলাপ-আলোচনা বা সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে এরা অক্ষম।

ডিপফেইক (Deep Fake)

ডিপফেইক হচ্ছে ভুয়া ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং যা দেখতে এবং শুনতে ঠিক বাস্তব মনে হয়। গত শতাব্দীর ফটোশপিং সফটওয়্যারের অনেক উন্নত একটি বিকল্প বলা

যেতে পারে ডিপফেইক। ডিপফেইকগুলো ভুয়া ঘটনাগুলির চিত্র তৈরি করতে ডিপ লার্নিং নামে এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। ডিপ লার্নিং এর সাথে মিলিয়ে ডিপফেইক নামটি ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ডিজইনফরমেশন বা ডিডি তথা ইন্টারনেটে কুতথ্যের ক্ষেত্রে ডিপফেইক একটি বড় বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

একজন রাজনীতিবিদের মুখে নতুন শব্দ রাখতে চান? আপনার প্রিয় সিনেমায় প্রধান অভিনেতারূপে অভিনয় করছেন এমন চান? অথবা একজন পেশাদারের মতো নাচতে চান? -ডিপফেইকের বদৌলতে এগুলো সব কিছুই করা সম্ভব। ডিপফেইক তৈরির ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়।

ধরা যাক, এমন একটি ভিডিও আপনি দেখলেন যেখানে বারাক ওবামা খুব বিশ্রী ভাষায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এমন কিছু দেখলে ওবামার অনুরাগীরা খুব হতাশ হবেন এবং ট্রাম্পের সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ডিপফেইকের যুগে মনে রাখতে হবে যে, এমন ভিডিওতে ওবামার মুখে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে তা ওবামার নাও হতে পারে। ডিপফেইক এত নিখুঁতভাবে মুখের মাংসপেশি, ঠোঁটের নড়াচাড়ার সাথে মিলিয়ে শব্দ-বাক্য বসায় যে তা সাদা চোখে ধরতে পারা অসম্ভব।

ডিপফেইকের সফটওয়্যারগুলো আজকাল এত উন্নত হয়েছে যে, এগুলো কিছুটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানলেই একটি ডিপফেইক কনটেন্ট বানিয়ে ফেলা সম্ভব। ভিডিও বা অডিওর পাশাপাশি কোন একটি ফটোকেও ডিপফেইক করা সম্ভব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media)

যে ওয়েবসাইট বা এপ্লিকেশনে এর ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারে, অন্যদের সাথে যোগাযোগ কিংবা অনুভূতি আদান প্রদান করতে পারে তাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া হল, এমন কোন তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম যেখানে এর ব্যবহারকারীরা মিলে একটি ভার্চুয়াল কমিউনিটি বা কৃত্রিম সমাজ গড়তে তোলে। সোশ্যাল মিডিয়া মূলত অনলাইন বা ইন্টারনেট সংযোগ নির্ভর হয়ে থাকে।

আর সোশ্যাল মিডিয়াগুলোও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনটি ওযেবসাইট নির্ভর আবার কোনটি হয়ত মোবাইল অ্যাপিলকেশন নির্ভর। কোন সোশ্যাল মিডিয়া শুধু

একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার সুবিধা দিয়ে থাকে। আবার কোনটি হয়তবা ভিডিও দেখার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক'-এর ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং তাঁদের মুহূর্তগুলোকে একে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে 'ইউটিউব' ভিডিও দেখার সুযোগ করে দেয়। এই ভিডিওগুলো অন্য কোন ইউটিউব ব্যবহারকারীর আপলোড করা।

সোশ্যাল মিডিয়া মানেই অনলাইন কমিউনিটি। অর্থাৎ, কোন অ্যাপ বা ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম হিসেবে তখনই গণ্য হবে, যখন এর কন্টেন্টগুলো তৈরি করবে এর ব্যবহারকারীরাই। যেমন, ফেসবুকের প্রতিটা পোস্ট কোন না কোন ইউজার তৈরি করছে। আবার সেটি দেখছেও অন্য ইউজাররা। ইউটিউবে এর ব্যবহারকারীরাই ভিডিও আপলোড করছে এবং তারাই আবার সেগুলো দেখছে। অর্থাৎ, সোশ্যাল মিডিয়ার মূল কনসেপ্ট হল শেয়ারিং!

অনলাইনে কুতথ্য চিহ্নিতকরণ

নীরা একটি সতেরো বছরের মেয়ে। সে মা-বাবার সঙ্গে ঢাকার কাছাকাছি এক উপজেলা শহরে থাকে। গতকাল আমেরিকা থেকে তার বড় মামা এসেছেন। নানা ধরনের উপহারসহ নীরার জন্য তিনি খুব সুন্দর একটি নীল রঙের টপস এনেছেন, সঙ্গে একটি বেলবটম জিনসের প্যান্ট। আজ কলেজের বার্ষিক শিল্প-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সেই নতুন পোশাকটি পরে এসেছে নীরা। সে আশা করেছিল সবাই তার নতুন ড্রেসের খুব প্রশংসা করবে। তেমন কিছু হলো না। বরং দু'একজন তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। যাই হোক, একটু পরে সে অনুষ্ঠান দেখায় মন দেয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই চলে গেল গার্লস কমনরুমের দিকে। সেখানে নীরাকে ঢুকতে দেখে সবাই ফিসফিস করতে শুরু করল। হঠাৎ করে একটি মেয়ে এসে ওকে বলল, "শুনলাম প্রিন্সিপাল স্যার নাকি এরকম কাপড় পরার জন্য তোকে ধমক দিয়েছেন?" নীরা বুঝতে পারল, তাকে নিয়ে অন্য মেয়েদের মাঝে আলোচনা চলছে। ওদিক থেকে আরেকজন বলে উঠল,"তোমাকে কিন্তু সালোয়ার কামিজেই বেশি মানায়।" একজন বলল, "তোকে বাসা থেকে কিছু বলল না? আমার মা হলে আমাকে বাসা থেকে বের হতে দিত না।"

এদের কথায় মন একটু খারাপ হয় নীরার। সে কমনরুম থেকে বেরিয়ে আসে। দেখা হয় দুই ক্লাসমেট সাকিব ও সজীবের সাথে। দুইজন হন্তদন্ত হয়ে তাকে খুঁজছে। কথা না বাড়িয়ে হুড়মুড় করে নীরার মুখের সামনে ইউটিউব খুলে ধরে সজীব। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না নীরার। আজকের অনুষ্ঠান চলার সময় মেয়েরা কয়েকজন মিলে কিছু সময়ে মঞ্চের নিচে একটু সময় হাতে-হাত ধরে নাচানাচি করেছে। এই নাচের ভিডিও "সত্যভাষী" নামের একাউন্ট থেকে

ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। মাত্র একঘন্টার মধ্যে প্রায় তিন হাজার ভিউ হয়েছে। নিচে অনেকগুলো কমেন্ট দেখা যাচ্ছে। নীরার চোখ ফেটে পানি চলে আসছে। তবু সে কমেন্টগুলো দেখতে থাকে।

- এই বদমাইশ মেয়েটার মা-বাপে তারে ভদ্র কাপড় পরা শেখায় নাই।
- তুই আমাদের ধর্মের কলঙ্ক।
- দেশি পোশাক ভালা লাগে না। তাইলে হ্যাগো কাছে চইলা যান।
- শালি তোরে হাতের কাছে একবার পাই। তোর নাচ বাইর করুম।
- রেইট কত?
- নাচতেই আছে। কাপড়-চোপড়ের দিকে নজর নাই। বেহায়া।

নীরার মাথা টলমল করছে। তবু কমেন্টগুলো পড়তে থাকে সে। 'বিদ্রোহী ২০২০" নামে একজন লিখেছেন, আপনাদের সমস্যা কি ভাই? সে তার ইচ্ছামত ড্রেস পরছে। আপনাগো কি?

এই কমেন্টের পালটা-উত্তর এসেছে ৩২টি। কয়েকটি এরকম।

- ভাই খুব তো নারী স্বাধীনতা করলেন। আপনের বইনরে এমন ড্রেসে বাজারে ছাড়বেন?
- এইবার নাস্তিক ঢুকছে আলাপে। দিবো সব নষ্ট কইরা। যা ভাগ।
- চোরের সাক্ষী বাটপার। যাও তোমার মা-বোনেরে এইবার ঈদের এমন ড্রেস কিন্না দিও।
- তুই যা। আপুমনির কাছে যা।
- এরা দেশটাকে অপসংস্কৃতিতে ভরিয়ে ফেলছে। আর কিছু সুশীল এই অশ্লীলতার সাফাই গায়।

ভাষা, বানান ও উপস্থাপনের ভঙ্গি ইত্যাদি দেখে নীরার হাত-পা কাঁপছে। বাসায় ফেরার রিকশা নেয়ার শক্তি পায় না সে। সজীব রিকশা ঠিক করে দিলে সে বাড়ি ফেরে। মামার দেয়া ড্রেসটা ছুঁড়ে ফেলতে পারলে সে বাঁচে। ইউটিউবের ব্যাপারটা বাসায় জানলে মা-বাবা তাকে আস্ত রাখবে না।

ডিডি সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও হতে পারে। এই গল্পটিতে নীরার বিরুদ্ধে মনগড়া, অবজ্ঞা ও ঘৃণা মুলক মন্তব্য করা হয়েছে।

কুতথ্যের অর্থনীতি

ঘটনাচক্রে হঠাৎ চোখে পড়ল একটি সংবাদ, দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনলাইন ক্লাস বন্ধ রেখেছেন। কারণ? তারা বলছেন সরকারের 'কঠোর' লকডাউনের ফলে তাদের পক্ষে অনলাইনে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে একটি শব্দ জানা ছিল, কিন্তু মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। এটাও কি সম্ভব? লকডাউন

কী করে অনলাইনের পাঠদানে অসুবিধা তৈরি করতে পারে? তাও আবার এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তা জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশবাসী জানে প্রকৌশলীদের আঁতুড়ঘর হিসেবে।

আরেকটি সংবাদ দিই। আমার এক আত্মীয় অসুস্থ বোধ করলে সবাই মিলে ভাবলাম কোভিড টেস্ট করানো উচিত। আজকাল অসুস্থতা গুরুতর হওয়ার আগেই এ টেস্ট করে ফেলা ভালো। তাতে অন্তত যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু অঘটনটি ওখানেই ঘটল। যার অসুস্থতার জন্য কোভিড টেস্ট করার কথা ভাবা হলো, তার বদলে তার স্ত্রীর কোভিড ধরা পড়ল।

একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলাম। মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে? যাকে তারা কোভিড বলে শনাক্ত করল, তার কোনো লক্ষণ নেই। লক্ষণবিহীন কোভিড বলে শুনেছিলাম কিন্তু তাও কি আমাদের পরিবারে? ভাবলাম দুজনের একসঙ্গে স্যাম্পল দেয়াতেই কি ভুল হলো? কী করা? ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে জানালেন, অপেক্ষা করুন। আরো কিছু টেস্ট দিচ্ছি, তবে আপাতত আলাদা ঘরে তাকে রাখুন। আবার কিছু রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন।

পরদিন সেই হাসপাতাল থেকে ফোন এল।

হ্যালো, আপনাদের বাসায় আমরা কোভিড পরীক্ষা করেছিলাম দুজনের। একজনের কোভিড শনাক্ত হয়েছিল। আপনারা তাকে কী করেছেন?

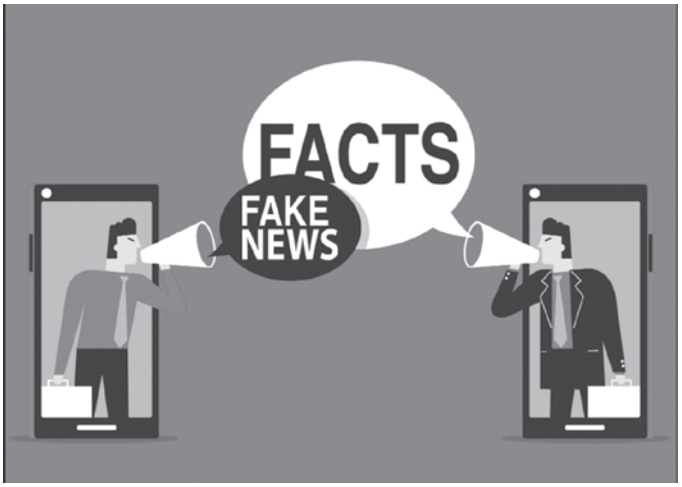

আবারো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এও কি সম্ভব? হাসপাতাল জিজ্ঞেস করছে রোগী কোথায়? চিকিৎসা শুরু করিয়েছেন? মনের মধ্যে খচ করে উঠল, তবে কি ইচ্ছে করেই তারা কাজটি করেছে? আর তাই হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। কোভিড রোগী ভর্তি করা মানে অনেক আয়! আজকাল কোভিড রোগীর ব্যবসা ভালোই চলছে। বলা হলো, আমরা বাসায়ই চিকিৎসা করাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ।

পরদিন রক্ত পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল। এখন পর্যন্ত সবকিছুই নরমাল মনে হচ্ছে। তবে ডাক্তারকে পেতে আরো একদিন অপেক্ষা করতে হবে। এদিকে সব টেস্টের মানে বোঝা ভার। তাই নিজেদের এক আত্মীয় ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে হলো। তার কাছে সবকিছু জিজ্ঞেস করে যা বুঝলাম, তাতে মনে হলো, যিনি কোভিড নেগেটিভ, তাকে নিয়েই চিন্তা করা উচিত। আর যিনি কোভিড পজিটিভ তার সবকিছুই বলা যায় নরমাল। কী করা যায়? কোথায় সাহায্য পাওয়া যায়? ততক্ষণে পরিবারের অনেকেই জেনে গেছে বিপদের কথা। আজকাল সংবাদ বাতাসের চেয়ে অধিক গতিতে ছড়িয়ে যায় বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ইন্টারনেটের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ যোগ করলে কী হয়, তা জানি না। তবে তা যে বিদ্যুতের চেয়েও গতিময় কিছু হয়, তা বলা বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ আসতে লাগল। আইভারমেক্টিনটিন শুরু করে দাও। রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করার জন্য একটি ইনজেকশন আছে তা দাও। দেরি করা যাবে না। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তিনি হাসছেন। কী করে হলো বুঝতে পারছেন না।

কেন তাকে সবার থেকে আলাদা থাকতে হবে, তাও বোঝানো যাচ্ছে না। রোগ বা অসুস্থতা শব্দের সংজ্ঞা বদলে গেছে এ যুগে। লক্ষণহীন রোগী কস্মিনকালেও শুনিনি। অন্যদিকে যার কোভিড নেই, তার মনের অবস্থা ভালো নেই। কী হবে? কফ ছিল। জ্বর ছিল। কাশি ছাড়ছে না। রক্তের টেস্ট বলছে কিছু একটা হয়েছে। এখন কী করা? রাত তখন ১২টা। পরিবারের সবাই আবারো ইন্টারনেটের দ্বারস্থ হলো। সবাই এখন সব জানতে পারে, সবকিছু। কিছু না জানলে গুগলকে জিজ্ঞেস করো। সবকিছুই এখন আঙুলের মাথায়। কখনো মনে হচ্ছে ভীষণ কিছু হতে যাচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে কোভিড টেস্টের স্যাম্পল কি অদলবদল হয়ে গেল? এ অবস্থাকে কীভাবে বর্ণনা করবেন। আমার মাথায় একটিই শব্দ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরিবারের সবাই কনফারেন্স কলে এসেছে কয়েকবার। কীভাবে কী করা। কোভিড রোগীকে কি আলাদা করব? নাকি যার কোভিড নেই, তাকে আলাদা করব? বাসার আয়তন এত ছোট নয় যে আলাদা কক্ষে একা থাকা যাবে না; কিন্তু বাথরুম? বাসায় মানুষ তিনজন। বাথরুম দুটো। কীভাবে কী করা।

যাকে মনে হচ্ছিল কোভিড, তাকে তো আগেই আলাদা করে দেয়া হয়েছিল। এবার? কথায় কথা বাড়ে। সবকিছু সবার মনেও থাকে না। রাত ২টায় একজন জানতে পারলেন হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছিল। তাকে হাসপাতালের ফোনের খবরটি জানাতে কারো মনে ছিল না। শুনেই বললেন, অবস্থা খুবই সঙ্গিন। হাসপাতাল মারাত্মক কোনো চিহ্ন না দেখে তো ফোন করেনি। কে ফোন ধরেছিল? তার কাছ থেকে বিশদ বিবরণ নেয়া দরকার। চলল অনেকক্ষণ জেরা। কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। জেরার ফলাফল শূন্য। কারণ বিশদ কিছু হাসপাতাল জানায়নি। কেবল জানতে চেয়েছে চিকিৎসা কোথায় চলছে? সেহরির সময় হতে চলল। কী করা যায়। পরিবারে কয়েকজন ডাক্তার আছেন। তাদের একজন ইন্টার্ন কিন্তু সে এরই মধ্যে কোভিড বিশেষজ্ঞ। তার মা কোভিড থেকে সুস্থ হয়েছেন কিছুদিন হলো। তার উপদেশে এই এই টেস্ট করে ফেলেন। অক্সিমিটার দিয়ে ব্লাড অক্সিজেন মনিটর করেন। আলাদা করো। একই কক্ষে কখনই একসঙ্গে ১০ মিনিটের বেশি করেন না। রোগীকে মাস্ক পরতে হবে। যিনি খাবারদাবার সরবরাহ করবেন, তাকেও মাস্ক পরতে হবে। কাউকে কোভিড রোগীর কক্ষে ১০ মিনিটের বেশি সময় থাকতে দেয়া যাবে না। তাতে সবার মঙ্গল। উপদেশগুলো আমাদের রোগী ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে সহায়ক ছিল।

পরিবারের আরেক দল ভাবতে লাগল কোথা থেকে ঘরে করোনাভাইরাস প্রবেশ করল? মনে হচ্ছে কাজের লোকের হাত ধরে ঘরে ঢুকেছে। বাসায় চুরি হলে দোষ হয় কাজের লোকের। ডাকাতি হলেও তাই। এখন কোভিড, তাতেও একই লোক প্রথমেই সন্দেহের তালিকায়। তাকে তো মাস্ক পরানোই যাচ্ছে না। সে বিশ্বাসই করে না কোভিড বলে কিছু আছে!

প্রায় একই সঙ্গে খবর এল, আরো এক বাসায় কাজের লোকের শরীর খারাপ। সে থাকে এক বয়স্কা নারীর সঙ্গে। তার কাজের লোকের অসুস্থতা শুনে সবাই প্রমাদ গুনছে। কী হবে এখন। তাকে কি বাড়ি যেতে বলব? কেউ কেউ সেই চেষ্টাও করল। কেউ কেউ বলল, না, তাকে আলাদা ঘরে রাখো। চিকিৎসা অবশ্য ততক্ষণে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বাদ সাধলেন সেই বয়স্কা নারী, যার সঙ্গে তিনি থাকতেন। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না তাকে। এ নারীই তার হাতের পাঁচ। তাকে নিয়েই চলে তার জীবন। বলা হলো, তাকে আলাদা করে রাখি আপাতত। একটি কক্ষ তাকে দেয়া যেতে পারে। না, তা হবে না। তার কিছু হয়নি। তাকে সেবা দিলেই ভালো হয়ে যাবেন। তার বিশ্বাস ও পরিশ্রমে তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভালোই হলেন।

এ বাসায় এতক্ষণে অন্যদের অবস্থা কাহিল। উপদেশের পর উপদেশ আসছে। কী করা যায়। যারা উপদেশ দিচ্ছেন, তারা আমাদের ভালো চাচ্ছেন। কিন্তু তাদের

উপদেশ মেনেই কি ওষুধ শুরু করে দেব? একজন বোঝালেন, এই কোভিড খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল করে দেয়। সময় দেয় না। অতএব, রাত পোহানোর দরকার নেই। আমি যে ট্যাবলেটের নাম দিচ্ছি, তা এক্ষুনি শুরু করে দেন। দরকার হলে আমি আসছি ওষুধ নিয়ে। ফোনের পর ফোন চলল। আলোচনা চলল। এদিকে দুজনই বয়স্ক। দুজনেই টিকা দিয়েছেন।

তবে যেদিন কোভিড ধরা পড়ল, সেইদিনই দুজনের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেয়ার কথা ছিল। একজনের শরীর খারাপ দেখে আমরা তাকে নিষেধ করলাম টিকা নিতে। গায়ে জ্বর। টিকা পরে দেয়া যাবে। কিন্তু যার কোনো জ্বর নেই, কোনো লক্ষণ নেই, তাকে টিকা নিতে পাঠানো হলো। অথচ রাতেই জানা গেল তারই কোভিড পজিটিভ। কী অবস্থা ভেবে দেখুন।

যাহোক, এখন কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। ওষুধ চালু করা কি ঠিক হবে? ওষুধ না দেয়া কি ঠিক হবে? খারাপ কিছু হলে তখন কী মনে হতে পারে? আবার ওষুধ দিয়ে খারাপ কিছু হলে বোকামির দায় কে নেবে? ডাক্তারের উপদেশ ছাড়া কী করা যায়। এখন তো পরামর্শ করার ডাক্তার পাওয়া যাবে না। তবে হাসপাতালে নিশ্চয় ডাক্তার থাকবে। তাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হোক। তাতে ঝুঁকি কমবে। সবই শুনছি। একজন বললেন, কিন্তু এখন সব হাসপাতালে তাকে নেবে না, যেতে হবে কোভিড হাসপাতালে। যার কোনো লক্ষণ নেই, তাকে কি কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? এমনও তো হতে পারে যে পুরো পরীক্ষাই ভুল। সেক্ষেত্রে তাকে কোভিড হাসপাতালে নেয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠানো হবে। থাকতে হবে কোভিড রোগীদের মাঝে। সেখানে রোগীদের কষ্ট দেখে তার নিজের অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে। কী করা যায়? আবারো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

পরদিন সকালে ডাক্তারকে রিপোর্ট পাঠানো হলো। তিনি 'কোভিড পজিটিভ' রোগীর রিপোর্ট দেখে তেমন কিছু করতে বললেন না। ভিটামিন ডি আর জিংক ট্যাবলেট দিলেন। বললেন, নিয়মিত অক্সিজেন পরীক্ষা করুন। আর বললেন, অক্সিজেন লেভেল নেমে গেলে জানাবেন। কিন্তু যার কোভিড নেগেটিভ, তাকে ওষুধ দিলেন। কিছু নতুন পরীক্ষাও দিলেন। বললেন, তাকেও অক্সিমিটারে অক্সিজেন লেভেল দেখবেন নিয়মিত। অতএব, একটি অক্সিমিটারে হবে না। দুটো লাগবে। একটি কোভিড পজিটিভ রোগীর জন্য, অন্যটি কোভিড নেগেটিভ রোগীর জন্য। সারা দিন সবাই ক্লাউড সভা করলেন। কী করা যায়? বাসায় দুই রোগী। তাও ভিন্ন প্রকৃতির। দুজনের দুই রকম অবস্থা। অবশিষ্ট এক ব্যক্তির অবস্থাও তথৈবচ। তার কোভিড

পরীক্ষা হয়নি। কিন্তু একা কী করে দুজনকে সামলাবেন। এদিকে যার কোভিড পজিটিভ, তিনি রীতিমতো সুস্থ। বুঝতেই পারছেন না তার ওপর এই অত্যাচার কেন? সম্ভবত যাদের বাসায়ই কোভিড এসেছে, তাদের অবস্থা একই রকম। বর্ণনা করছি কারণ যাদের বাসায় আসেনি, তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে।

এরই মধ্যে বিকালবেলা ফোন বাজল। হ্যালো, কে? আমরা জানতে পেরেছি আপনাদের বাসায় একজন কোভিড রোগী আছেন। তার চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা হয়েছে? আমরা সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে কথা বলছি। জি, কী জন্য? আমাদের কাছে তথ্য আছে আপনাদের বাসায় একজন কোভিড রোগী আছেন। তার চিকিৎসার খোঁজ নিচ্ছি। আমাদের সরকারি ডাক্তার কিছুক্ষণ পর আপনার এ নম্বরে কথা বলবেন। কী করতে হবে সেই উপদেশ দেবেন! প্রয়োজনে ডাক্তার রোগী দেখতে যাবেন। ভাবতেই পারছি না, আমরা বাংলাদেশে বসবাস করছি। এও সম্ভব বাংলাদেশে? সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ উদ্যোগে আবারো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বুঝতেই পারছেন প্রতিদিন কয়েক হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পরও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মতৎপরতা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি ভাবছি কী করে এ অসম্ভব সম্ভব হলো?

ঠিকই কিছুক্ষণ পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাক্তার ফোন করলেন। জানতে চাইলেন কোনো সহায়তা লাগবে কিনা। ওষুধ লাগবে কিনা? আপনারা কী ভাবছেন জানি না, তবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কোভিড শনাক্ত হওয়ার পর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় অক্সিমিটার দেখা হচ্ছে। কিন্তু কোভিড রোগীর অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি। তিনি নির্জনে বসে একাকী কবিতা লিখছেন। একা এক কক্ষে আলাদা থাকা সময়ের মোক্ষম ব্যবহার তিনিই করছেন। বাকি সবাই বাস করছে ভীতির মাঝে। কিছুই করার নেই। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো ১০ দিন। আশা করি সবাই ভালো থাকবে। আগেই বলেছি দুজনেই বয়স্ক। পরিবারের চিন্তা ওখানেই। কোভিড নেগেটিভ রোগীর আরো পরীক্ষা করা হলো। জানা গেল তাকে বাসায় রাখা ঠিক হবে না। চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সবার মাথায় বাজ পড়ল। রাতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। চিকিৎসা চলছে। অপেক্ষা করছি।

তবে এ ডামাডোলে আমাদের মাঝে একটি সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। চেনা পরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই আমাদের নানা উপদেশ দিয়েছেন। তাদের আদেশ কিংবা উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজে বহুজন আপনাকে ভালোবাসে।

তাদের উপদেশ আপনাকে হয়তোবা ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত করবে কিন্তু জানবেন তারা আপনাকে ভালোবেসেই উপদেশ দিচ্ছেন। তবে বিভ্রান্তির কারণে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করাই উত্তম। কারণ আমাদের সবার শরীর-মন যেমন এক নয়, তেমনি আমাদের সবার শরীরে সব ওষুধ সমান উপকারী নাও হতে পারে। দেশে এমনিতেই অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার অনেক বেশি। অনেকেই ভীত হয়ে তা গ্রহণও করছেন বা ডাক্তারের ওপর নিজে ডাক্তারি করছেন। কখনো উপকার হবে কখনো হবে না। তবে জানবেন ওষুধ সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত না হলে ভবিষ্যতে আপনার দেহে তার কার্যকরতা হারাবে।

আরেকটি ঘটনা। মনে পড়ে কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের এক বেসরকারি বিমান কোম্পানির উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার কথা? তখন ইউটিউব কিংবা পত্রপত্রিকায় রব উঠেছিল বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার কারণ ছিল বিমানবন্দরের টাওয়ার থেকে দেয়া ভুল বার্তা। সেই সম্পর্কিত ককপিট বার্তার একটি অডিও এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে ইন্টারনেটে। দেশে সর্বত্র রব উঠেছিল তাদের ভুলে আমরা হারিয়েছি এতগুলো প্রাণ। বিতর্কের অন্ত ছিল না অনলাইনে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন। উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার ইনভেস্টিগেশন নিয়ে আমার কৌতূহল ছিল সবসময়। কোনো দুর্ঘটনার পরপরই এ রকম বার্তা এত তাড়াতাড়ি প্রচার করতে দেখিনি। কদিন আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির একটি পর্বে সেই দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবাক হয়ে দেখলাম তখনকার অনেক সংবাদই ছিল গুজব। কেউ গুজব তৈরি করেছিল। তবে গুজব ছড়িয়ে দেয়ার লোকের অভাব হয় না। আমরা গুজব ছড়াই না জেনে না বুঝে। দেখবেন গুজব যারা ছড়িয়েছিল তাদের অনেককেই আপনি বিশ্বাস করেন। ওই গুজব উড়োজাহাজটির তখনকার অধিকর্তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তাদের অবহেলার দোষ তারা ঢাকতে পেরেছিল। তদন্তের গতি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার এমন নিখুঁত পরিকল্পনার পেছনে কারা ছিল তা এখন অন্তত আন্দাজ করা যায়।

ইন্টারনেটে অনেক গল্প ছড়ায়। সত্য-মিথ্যা নানারকম। বিজ্ঞজনেরা বলেন, আপনার তত্ত্বকথা সত্যি না মিথ্যা, তা যাচাইয়ের মাধ্যম হলো গবেষণা সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল দেখা। যেখানে বিজ্ঞজনেরা সুচিন্তিত মতামত দেবেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন। সাধারণত আমজনতার মাধ্যমে কখনো বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তবে গুজব তৈরি করে ব্যবসায় লাভ করা যায়। কোভিড সম্পর্কিত নানা গুজবে কোনো কোনো ওষুধের চাহিদা বাড়ে। স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা তখন সেই ওষুধের মজুদ গড়ে তোলে। বাজারে দেখা দেয় সংকট। তাতে অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী

দাম যায় বেড়ে। যার কাছেই ওষুধের মজুদ পাওয়া যাবে, তাকেই শাস্তির আওতায় আনার দাবি ওঠে আমজনতার মাঝে। সরকার বাধ্য হয় শক্ত হাতে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে। বাড়িয়ে দেয় নজরদারি। তাতে হিতে বিপরীত হয়। বাজার থেকে ওষুধ উধাও হয়ে যায়। কারণ ভালো ব্যবসায়ীরাও ওই ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে দেন। ভাবেন অহেতুক ঝামেলায় কেন যাব? ওষুধ চলে যায় কালোবাজারে, লোভী কিছু ব্যবসায়ীর হাতে। কালোবাজারি আর নেশাকারবারিদের নিয়ম এক। এমন অবস্থায় পণ্যটি কোথায় আছে তার প্রচার হবে অতি সংগোপনে। চুপিসারে। কেউ একজন আপনাকে জানাবে, এই নাম্বারে ফোন করুন, এখানে মেসেজ করুন, কাউকে বলবেন না, ওষুধ পেয়ে যাবেন। এমন অবস্থায় আপনার জানার উপায় নেই ওষুধটি সঠিক নাকি ভেজাল। ফলে ভালো করতে গিয়ে বিপদও হয়ে যেতে পারে।

তাই একটু ভাবতে হবে। কেবল ডাক্তারই পারেন আপনাকে সঠিক ওষুধ দিয়ে সাহায্য করতে। গুজব ছড়িয়ে নয়। কেবল ডাক্তার আর নার্সরাই থাকবেন আপনার সঙ্গে। গুজব সৃষ্টিকারী কিংবা কালোবাজারি নয়। এত মৃত্যুর মাঝেও আমরা জেনেছি ২৮ দিনে দেশে ২১ জন ডাক্তার প্রাণ হারিয়েছেন। ডাক্তার ও নার্সরাই আমাদের এখনকার সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধা। তাদের প্রতি আস্থা রাখুন। তাদের সম্মান করুন।

কুতথ্যের মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

কুতথ্য এক অতি অদ্ভুত মজাদার, মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর জিনিস। তবে কুতথ্যের দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। কোনো জাতির ব্যবসায়ী, পুলিশ ও পোশাকশিল্পমালিক, রাজনীতিক ও রঙের মিস্ত্রি, সাংবাদিক ও সাংসদ, আমলা ও আমের আড়তদার সবার মধ্যে বাইরে যত পার্থক্যই থাকুক, কোনো একটি মৌলিক জায়গায় তারা সবাই এক। তাদের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র ও ধর্মে-কর্মে একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকেই। কোনো জাতির সবচেয়ে মেধাবী মানুষটি ও সবচেয়ে নির্বোধের মধ্যেও একটি মিল থাকে। সব মানুষই কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। কলাম লেখক ও কেরানি, কুতথ্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা প্রথমেই জনগোষ্ঠীর সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন। কোনো কোনো সমাজের মানুষের কুতথ্য তৈরি করে এবং কুতথ্য প্রচার করে অপার আনন্দ। কুতথ্য উপভোগ করার আনন্দ আরও বেশি। যে সমাজে সাধুসন্ত ও পীর-ফকিরের প্রাধান্য, সেখানে কুতথ্য যে অতি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ কি?

মওলানা ভাসানী নৌকা না পেলে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপার যেতে পারতেন এ কথা বিশ্বাস করার মতো মানুষ বাংলার মাটিতে বিরল নয়। শেরেবাংলা ফজলুল হক একবারে ৮০টি ফজলি আম খেতে পারতেন এ কথা উচ্চারিত হয়েছে উচ্চশিক্ষিত বাঙালির মুখ থেকেই। ৮০টি ফজলি আমের ওজন ৬০ কেজির কম নয়। যেহেতু তিনি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বড় নেতা, সুতরাং দেড় মণ আম ধারণ করার মতো পাকস্থলী তাঁর না থেকেই পারে না।

তবে গুজব আর কুতথ্য জ্ঞাতিভাই হলেও ঠিক একই জিনিস নয়। অতিরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে, কিন্তু কুতথ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তা ছাড়া কুতথ্য সৃষ্টির একটি পটভূমি থাকে। যে সমাজে সত্য অপেক্ষাকৃত অনুপস্থিত এবং মিথ্যার প্রাধান্য রয়েছে, অথবা সত্য গোপন করার প্রবণতা খুব বেশি, সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে গুজবই ভরসা।
শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির অপারেশনে মধ্যরাতের অন্ধকারে কতজন নিহত হয়েছেন, তার সঠিক সংখ্যা সরকারের দিক থেকে জানানো হয়নি। হেফাজতের দিক থেকেও নামধামসহ তালিকা সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং এক ধাক্কায় সংখ্যাটা আড়াই হাজারে পৌঁছে দেওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল না। এবং তা অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা দোষেরও নয়।

কুতথ্য তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটটি তৈরি করা ছিল। ঘটনাটি দিনদুপুরে হলে কুতথ্য রচয়িতারা সংখ্যাটা অত দূর পর্যন্ত নিতে পারতেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, সেদিন অপারেশনে এক লাখ ৫৫ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ খরচ হয়েছে। 'অবরোধের দিন দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার টিয়ার শেল, ৬০ হাজার রাবার বুলেট, ১৫ হাজার শটগানের গুলি এবং ১২ হাজার সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়। এর বাইরে পিস্তল ও রিভলবার জাতীয় ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলি খরচ হয়েছে মাত্র সাড়ে ৩০০ রাউন্ড। ...অবৈধ জমায়েতকে ভয় দেখাতে এবং তাদের মনোবল ভেঙে দিতে মূলত এই অপারেশনে হ্যান্ডগ্রেনেড এবং রাবার বুলেটের ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। রাত ২টা ৩১ মিনিটে মূল অপারেশন শুরু হলেও রাত ১০টার পর থেকেই মূলত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তিনদিক থেকে ধীরে ধীরে শাপলা চত্বরের দিকে এগুতে থাকে। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই অভিযানের নাম দেওয়া হয় "অপারেশন সিকিউরড শাপলা"। র‍্যাবের সাংকেতিক নাম ছিল "অপারেশন ফ্লাশ আউট"। অন্যদিকে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ওই অপারেশনের নাম দেয় "অপারেশন ক্যাপচার শাপলা"।' [যুগান্তর, ১২ মে ২০১৪]

নির্ভরযোগ্য উৎস যাচাই

আমরা কেউ অনলাইন কুতথ্য বা ইন্টারনেট কুতথ্য দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হোক তা চাই না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অনলাইনে কুতথ্য বিষয়ে সতর্ক হতে শেখা। অনলাইনে কুতথ্য চিহ্নিত করতে শেখা।

বিশেষজ্ঞরা কীভাবে ভূয়া তথ্য/কনটেন্ট (সংবাদ, অডিও, ভিডিও, ইমেজ, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন। মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেটে যেকোন তথ্য পড়া বা দেখা মাত্র একটি সিদ্ধান্ত না নিয়ে, মন্তব্য না করে কিংবা অন্যদের শেয়ার করার আগে, উচিত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খেয়াল করা। এখানে উত্তর আয়ারল্যান্ডভিত্তিক ফ্যাক্ট চেক সংস্থা বিশেষজ্ঞরা কীভাবে ভূয়া তথ্য/কনটেন্ট (সংবাদ, অডিও, ভিডিও, ইমেজ, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন। মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেটে যেকোন তথ্য পড়া বা দেখা মাত্র একটি সিদ্ধান্ত না নিয়ে, মন্তব্য না করে কিংবা অন্যদের শেয়ার করার আগে, উচিত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খেয়াল করা। এখানে উত্তর আয়ারল্যান্ডভিত্তিক ফ্যাক্ট চেক সংস্থা ফ্যাক্টচেকএনআই (FactCheckNI), নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরি এসোসিয়েশনস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন (The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) কীভাবে অনলাইন কুতথ্য তথা ভূয়াতথ্য চিহ্নিত করার পরামর্শ দেয় তা দেখতে পারি।

ফ্যাক্টচেকএনআই (FactCheckNI) : সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করুন : তথ্যটি কি সঠিক? বিশ্বাসযোগ্য? যথাযথ তথ্য অন্যদের সংগে শেয়ার করুন।

তথ্যের উৎসটি সম্পর্কে জানা না থাকলে, ওয়েবসাইটের 'আমাদের সম্পর্কে' পৃষ্ঠা দেখুন। অথবা, নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন এরা এই তথ্যটি শেয়ার করছে।

তথ্যের কোন উৎস দেয়া না থাকলে, একটা কিছু খুঁজে বের করুন : হতে পারে একটি ইমেজ বা একটি কাহিনী। খুঁজে দেখুন আগে কোথায় ইমেজটি দেখা গিয়েছে বা কাহিনীটির সূচনা হয়েছে।

সাইটটি দেখতে ঠিকঠাক মনে না হলে, সাবধান। অনলাইনে কুতথ্য প্রচারকারী সাইটগুলো অনেক সময় আসল কোন সাইটের মত মনে হতে পারে। লক্ষ্য করুন সাইটের ইউআরএল (URL) গোলমেলে লাগছে কিনা, ভুলভাল বানানে ভর্তি কিনা,

অথবা সাইটের নকশা/বিন্যাস খাপছাড়া কিনা।

ধরা যাক, আপনি দেখলেন, একটি সাইটে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান করে অনেক কথা লেখা হয়েছে এবং সাইটটির উপরের দিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। কথা হচ্ছে, আমাদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। খবরটি পড়ার সময় মাথায় রাখতে হবে, বিটিভি'র মত একটি প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী প্রচারণা করতে পারে কি? [একই সঙ্গে এই তথ্যটিও মাথায় রাখা যে, কোন প্রতিষ্ঠানের লোগো নকল করে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা এমন কঠিন কোন ব্যাপার নয়।]

শুধু শিরোনাম নয় পুরো কাহিনী পড়ুন। ইমেজ, উল্লিখিত সংখ্যা এবং কোটেশনগুলো খেয়াল করুন। হতে পারে এগুলোর উৎস দেয়া নেই বা প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমেজগুলো ভূয়া হতে পারে। ভূয়া খবরের ক্ষেত্রে মূল ইমেজ বা ভিডিওগুলো পাল্টে দেয়া হতে পারে। অন্যরা কি বলছে যাচাই করুন। সন্দেহজনক তথ্যের ক্ষেত্রে যে উৎস দেয়া হয়েছে তা একবার যাচাই করে নিন। বিশ্বস্ত ও সুপরিচিত নিউজ সাইট বা তথ্য যাচাইকারী [ফ্যাক্ট চেকার] সাইটগুলো কি বলছে তা দেখুন।

ভুয়া তথ্য আপলোডকারীরা আবেগ-অনুভূতির সুযোগ নেয়

এই লোকগুলো জানে যে, মানুষকে রাগান্বিত করলে বা দুশ্চিন্তায় ফেলা গেলে তারা বেশি ক্লিক পাবেন [কারণ আপনি এই তথ্যটি বেশি শেয়ার করবেন বা বারবার দেখবেন]। শেয়ার করার আগে ভাবুন, কিভাবে আপনি এটি যাচাই করতে পারেন।

অতিরিক্ত ভালো কিছু মনে হলে, ঝামেলা থাকতে পারে। আশাবাদ দেখিয়েও আমাদের ধোঁকা দেয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোন একটি সাইটে, জটিল কোন রোগ অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে সারিয়ে দেয়া সম্পর্কে ওয়েবসাইটে কিছু পড়লেন বা দেখলেন। এক্ষেত্রে, মনে রাখতে হবে, বেশির ভাগ সময় [জটিল রোগের] মিরাকল নিরাময়ের কাহিনী সত্য হয় না।

কৌতুক বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বুঝতে হবে

অনলাইনে কৌতুক করে বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে কিছু বলা, লেখা বা করা হয়ে থাকতে পারে। [এটাকে আচমকা অনলাইন কুতথ্য বলা ঠিক হবে না।] উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি সিনেমাতে কোন একটি ধর্মের একজন ধর্মগুরুর পোশাক পরা কোন একটি চরিত্রকে কোন হাস্যকর কাজ করতে দেখা গেলে বা তাকে নিয়ে অন্য কোন একটি চরিত্র কৌতুক বা ব্যঙ্গ করলে, সাধারণত তাকে অনলাইন কুতথ্য হিসাবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। কিংবা এই চরিত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধর্মটির ধর্মগুরুদের অপমান করা হচ্ছে, সাধারণত এমন বোঝায় না। অন্য যে কোন পেশা বা বৃত্তির মানুষের ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে।

আইএফএলএ (IFLA) বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করেছে :

ফ্যাক্টচেকএনআই (FactCheckNI) মনে করে, যে কেউ চাইলেই এখন ফ্যাক্ট চেকিং করতে পারে। কেবল কয়েকটি প্রশ্ন-ধাপের সাহায্যেই, অতি সহজেই আমরা যেকেনো তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পারি।

নিম্নের এই ছয়টি ধাপ অনুসরণ করলে, অনলাইনের অগণিত তথ্যের মধ্য থেকে সঠিক তথ্যটি বাছাই করা সম্ভব।

খেয়াল রাখুন

- কে
- কি
- কোথায়
- কখন
- কেন
- কিভাবে

কে?

আপনি যখন অনলাইনে বা অন্য কোথাও তথ্য পড়েন বা দেখেন তখন একটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত এটি কে বলেছে বা কে বানিয়েছে। অনলাইন তথ্যের সাথে সম্পর্কিত, কোনও টুইট বা ব্লগ আর্টিকেলের উৎসই নিশ্চিত করবে, যে তথ্যটি কি কোনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে নাকি এর নির্দিষ্ট কোন এজেন্ডা আছে। এভাবে, "কে" তথ্যটি শেয়ার করেছে? তা কি নির্ভরযোগ্য ও অফিসিয়াল উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা? তাতে তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। ধরা যাক, বাংলাদেশের জেলা সংক্রান্ত প্রশাসনিক তথ্যগুলো নেয়ার ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন" (https://bangladesh.gov.bd) হচ্ছে একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

কি?

যে তথ্য শেয়ার করা হয়েছে, সেটি কি বাস্তব সত্য নাকি কারো মতামত? যে তথ্যটি শেয়ার করা হচ্ছে তা কি সম্পূর্ণরূপে শেয়ার করা হয়েছে নাকি কেবলমাত্র তার কিছু অংশই ব্যবহার করা হয়েছে। এটি যাচাই করার একটি উপায় হল, একই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে পড়া, যাতে আপনি বুঝতে পারেন তথ্যের কোন অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কোন অংশ জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে।

কোথায়?

নির্দিষ্ট কাহিনী বা তথ্যের অংশটি কোথায় শেয়ার করা হচ্ছে তা বিবেচনা করাও অত্যন্ত জরুরি। খুব সহজ পরীক্ষাটি হলো এটি কি পাবলিকলি নাকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেয়ার করা হচ্ছে? এটা চিহ্নিত করতে পারলে বোঝা যাবে এই তথ্যটি বিশেষ কোন পাঠক/ শ্রোতা/ দর্শক গোষ্ঠীর সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে কিনা। এর ফলে আরো বোঝা যাবে এই তথ্য/আইটেমটি কোনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল কিনা?

কখন?

কোন একটি তথ্য প্রকাশ বা প্রচারের সময়কাল বিবেচনায় নিলে তথ্যটি সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝে নেয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, এই তথ্যটি কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগেবা পরে শেয়ার করা হয়েছিল? আজকের যুগে সময় এবং প্রসঙ্গ উভয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। [উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, "ক" জেলার একজন লোক, "খ" জেলাতে গণপিটুনীতে প্রাণ হারিয়েছে। এই খবর জানার পরে যদি, "ক" জেলার কিছু লোক, নানারকম সত্য বা মিথ্যা বা সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে তাদের এলাকাতে বসবাসকারী "খ" জেলার লোকদের ব্যাপারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিতে শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, তারা "খ" জেলার লোকদের ব্যাপারে অতীতের কোন নেতিবাচক ঘটনা সামনে নিয়ে এসেও পোস্ট দিতে থাকে। এমন কিছু হলে, পোস্টগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার আছে।]

কেন?

"কেন" একটি তথ্য আপলোড করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। [কেননা, কারণ ব্যাখ্যাকারী ও তথ্য শেয়ারকারীর মধ্যে এ ব্যাপারে ভিন্নতা থাকতে পারে।] তবে এ ব্যাপারে সচেতন থাকলে বাস্তব-সত্য এবং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতের মধ্যে যে একটি পার্থক্য আছে তা বোঝা সহজ হবে। আপলোডকরীর তথ্যটির মধ্যে কোন একটি দিকে ঝোঁক স্পষ্ট কিনা, এর মধ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক / সামাজিক / অর্থনৈতিক কোন এজেন্ডা আছে কিনা তা বিবেচনা করা দরকার।

কিভাবে?

একটি তথ্যের [প্রবন্ধ, অডিও, ভিডিও যাই হোক] ভাষা কি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী? সরাসরি পক্ষপাতদুষ্ট? এই তথ্যের উপস্থাপনার ধরণটি কেমন? (উদাহরণস্বরূপ, উসকানিমূলক, সূক্ষভাবে "অন্যদের" বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক) এটা কি একটি বিবৃতি হিসাবে এসেছে? এটা কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এমন কোন প্ল্যাটফর্মে দেয়া হয়েছে যে প্ল্যাটফর্ম থেকে [বাজে] বিতর্কের জন্ম হয়? এটা কতটা পাবলিক?

কোন তথ্যকে সন্দেহজনক মনে হলে বা অনলাইন কুতথ্য মনে হলে, এই সন্দেহ অমূলক বলে উড়িয়ে দেবেন না। আগে যা আলোচনা হয়েছে তা মনে রাখুন। এছাড়া নিচের কাজগুলো করতে পারেন।

যে তথ্যটি দেয়া হচ্ছে বা যে দাবিটি করা হচ্ছে, সেটির ব্যাপারে আরো জানার জন্য ইন্টারনেটে খুঁজতে থাকুন। অনলাইন ফ্যাক্ট-চেকারগুলোতে একবার খোঁজ করতে

পারেন। যদি দেখেন যে তথ্যটি দেয়া হচ্ছে বা যে দাবিটি করা হচ্ছে, সেটি সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পাচ্ছে না, তাহলে এমন হতে পারে যে সাংবাদিকরা উক্ত সংবাদ বা তথ্যে সত্যতা নিশ্চিত হতে পারেন নি।

কে তথ্য/কন্টেন্টটি পোস্ট করেছে তার প্রোফাইল দেখুন, কতদিন ধরে তার একাউন্টটি অ্যাকটিভ আছে তা লক্ষ্য করুন। বোঝার চেষ্টা করুন, একাউন্টটি থেকে যে পোস্টগুলো দেয়া হয়, সেগুলো মেশিন/বট (Bot) চালিত মনে হয় কিনা? উদাহরণস্বরূপ, যদি দেখা যায় একটি একাউন্ট থেকে সারাদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান উল্লেখপূর্বক পোস্ট দেয়া হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে খুব বিভক্তিমূলক রাজনৈতিক বক্তব্য থাকছে এবং অন্যান্য একাউন্ট থেকে কনটেন্ট রিটুইট করা হচ্ছে, তাহলে মনে করতে পারেন যে এই কাজে কোন যন্ত্রের/বট ব্যবহার করা হচ্ছে।

সন্দেহ দেখা দিলেই এর সত্যতা বাছাই করে নেয়া ভালো। তবে একথা ঠিক, সব সময় নিজে-নিজে অনলাইনে কুতথ্য চিহ্নিত করার কাজ সহজ নাও হতে পারে। এমতাবস্থায়, কোন একটি তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই তথা অনলাইন কুতথ্য কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য অনলাইন ফ্যাক্টচেক সাইটগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

আজকাল পৃথিবীর সব দেশে এধরণের অনেক সাইট কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী প্রবাসী/ অভিবাসীদের জন্য অনলাইন কুতথ্য বা ইন্টারনেট কুতথ্য বিষয়ে কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিডিফ্যাক্টচেক (BdFactCheck) (https://bdfactcheck.com/)| এই প্রতিষ্ঠানটি "যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে রেজিষ্ট্রেশনকৃত একটি নন-প্রফিট সংস্থা।"

এই সংস্থাটি যে সমস্ত তথ্যের ফ্যাক্ট চেক করে থাকে সেগুলো কোন আলোচনা সভা, প্রেস কনফারেন্স, জনসভা কিংবা গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছায়। তাছাড়া, সামাজিক মাধ্যমে যেসব সংবাদ, ছবি কিংবা ভিডিও ভাইরাল হয় সেগুলোরও ফ্যাক্ট চেক করে থাকে বিডিফ্যাক্টচেক।

কেউ চাইলে কোন তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিডিফ্যাক্টচেককে অনুরোধ করতে পারেন। এজন্য তাদের সাইটে একটি নির্ধারিত ফর্ম (https://bdfactcheck.com/?page_id=278) দেয়া আছে। বিডিফ্যাক্টচেক পাচঁটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করে থাকে। এগুলো হচ্ছে তথ্য নির্বাচন, গবেষণা, গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিবেদন লিখন, সম্পাদনা ও সংশোধন।

- সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (যেমন, ফেসবুক, কোন ব্লগ, ইউটিউবের কমেন্ট সেকশন ইত্যাদি) কোন বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি তর্ক-বিতর্ক হয়?

- সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি তর্ক-বিতর্ক হয়, সেগুলো কতটা স্বাভাবিক তর্ক-বিতর্ক আর কতটা অনলাইন কুতথ্য'র রূপ নেয়?

- ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এমন বক্তৃতা, ভিডিও বা ইমেজে অনলাইন কুতথ্য দেখা যায় কি? কোন বিষয়গুলোতে অনলাইন কুতথ্য বেশি দেখা যায়?

- স্থানীয় অভিজ্ঞতা কেমন? অনলাইন কুতথ্য'র কারণে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

- অনলাইন কুতথ্য'র কোন প্রভাব সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতির উপরে পড়ে কি? যদি পড়ে থাকে, তা কেমন?

নাগরিক সমাজ

ইংরেজি Civil society অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ তা আসলে কি? সুশীল সমাজ বলতে কি বোঝায় এবং কে বা কারা নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে আর কারা এর বাইরে থাকবে এসব বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। তবে বর্তমানকালে একটি বিষয়ে সর্বমহল একমত যে, নাগরিক সমাজ হচ্ছে রাষ্ট্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারিবারিক পরিসরের বাইরে মানুষে-মানুষে যুক্ততার একটি পরিসর। সুশীল সমাজ রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলের অংশ নয়। আবার এটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বা ব্যবসায়িক ইচ্ছাপূরণ বা স্বার্থসিদ্ধির পরিসরও নয়। সুশীল সমাজের সদস্য বা নাগরিক সমাজের সংগঠন বলতে সেসব ব্যক্তি বা সংগঠনকে বুঝবো যে বা যারা মোটাদাগে রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধবিরোধী যেকোন রাজনৈতিক বা সামাজিক তৎপরতার বিরোধিতা করে থাকে। সুশীল সমাজের অংশ হতে পারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিভিত্তিক সংগঠন, সংবাদমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানস সরোবর বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। মোটাদাগে, এনজিওদেরও সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্দেশ্যবিহীন দাতব্যভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া বা বিনোদনধর্মী সংগঠনগুলোকেও অনেকে সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

নাগরিক সমাজ সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মৌলিক তফাৎ আছে। রাজনৈতিক দল নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে ক্ষমতায় যেতে চায় এবং ক্ষমতায় এসে নীতি-আদর্শগুলো বাস্তবায়ন করতে চায়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ কোনভাবেই নাগরিক বা সুশীল সমাজের কর্মতৎপরতার অংশ নয়।

প্রথাগত সুশীল সমাজ : খেয়াল করেছেন যে, শিরোনামে সুশীল সমাজের আগে প্রথাগত বা Traditional শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের ইতিহাস বেশ পুরোনো। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন বেঙ্গল রেঁনেসার সূচনা হয়েছিল, তখন থেকে বলতে গেলে বঙ্গীয় নাগরিক বা সুশীল সমাজের সূচনা। বেঙ্গল রেঁনেসা বলে আদৌ কিছু হয়েছিল কিনা তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত রয়েছে। বিতর্ক একপাশে রেখে এটুকু অন্তত বলা চলে যে, উল্লিখিত সময় থেকে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের ফয়সালা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের নানামাত্রিক মিথস্ক্রিয়ার আধুনিক ধরণ

চালু হতে থাকে, যা ছিল পূর্ববর্তী মোগল বা নবাবী আমল থেকে ভিন্ন। ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিশীলতা, আইনের শাসন, সংবিধান, মতপ্রকাশের অধিকারের ধারণাগুলো সে সময় থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার রোধ, শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলায় অধিক মনোযোগদানের মত বিষয়গুলোতেও নব-বিকশিত নাগরিক সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজ নানা ফর্মে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন বিরোধী কর্মকাণ্ডে নানামুখী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পরে সামরিক শাসন বিরোধিতা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রক্ষা, উগ্রবাদী, মৌলবাদী শক্তির হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষায় সুশীল সমাজ উল্লেখ্যযোগ্য কাজ করছে।

উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে, নাগরিক সমাজ শব্দটি কিন্তু খুব একটা পুরোনো নয়। গত শতকের আশির দশকের শেষ ও নব্বই দশকের শুরুর দিকে সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ার সাথে-সাথে সিভিল সোসাইটি শব্দটির ব্যবহার বাড়তে থাকে। বিশেষ করে, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ভাঙা এবং উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমা তাত্ত্বিকেরা সুশীল সমাজের ভূমিকার উপরে জোর দেন। আমাদের দেশেও কাছাকাছি সময় থেকে নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ কথাটি ব্যবহার শুরু হয়। শুরুতে বেশ কিছুদিন সিভিল সোসাইটির বাংলা কি হবে তা নিয়ে তর্ক চলে। কেউ সিভিল সোসাইটি শব্দ দুটো অনুবাদের কোন দরকার নেই বলে মত দেন। কেউ এর বাংলা করেন সিভিল সমাজ। কেউ বলতে থাকেন এটা হবে নাগরিক সমাজ। অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে মূলত মিডিয়ায় ব্যবহারের বদৌলতে সিভিল সোসাইটির বাংলা হিসেবে সুশীল সমাজ শব্দ দুটি স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

সুশীল সমাজ শব্দদুটির ব্যবহার শুরুর পূর্বে "সুধী সমাজ" বা "বুদ্ধিজীবী সমাজ" শব্দগুলো দ্বারা একই ধারণাই প্রকাশিত হতো। আমরা প্রথাগত সুশীল সমাজ বলতে এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থেকেছি বিশেষ একটি কারণে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু সচেতন মানুষের মধ্যে গতশতকের নব্বুইয়ের দশক থেকে সুশীল সমাজ ও এনজিওকে সমার্থক করে দেখার একটি অভ্যাস তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতা মূলত সুশীল সমাজের ব্যাপ্তিকে কমিয়ে দেয়। এনজিও নিঃসন্দেহে সুশীল সমাজের অংশ। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এনজিওদের সুশীল সমাজের একমাত্র অংশ মনে করলে, বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে দুই শতাব্দি ধরে যে ধরণের সংগঠনগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে সুশীল

সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে সেগুলো উহ্য হয়ে যায়। এই বিবেচনা থেকে আমরা প্রথাগত সুশীল সমাজ কথাটা ব্যবহার করেছি। প্রথাগত সুশীল সমাজ বলতে আমরা বুঝিয়েছি, সেসব সংগঠন যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসব সংগঠন হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত। অনেক সময় মূলত সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রম ও অর্থায়নে পরিচালিত। গত কয়েক দশকে এই ধরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনগুলোর অবস্থা পড়তির দিকে হলেও, এখনো পর্যন্ত জেলা-উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এধরণের সংগঠনগুলোই সুশীল সমাজের প্রাণ। বলতে চাইছি, এই ব্যক্তিরাই হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথাগত সুশীল সমাজের প্রাণ। স্থানীয় মানুষ হিসেবে সম্প্রীতি, শুভেচ্ছা, সহনশীলতা, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষ-বিপক্ষের শক্তিগুলো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে। এই শক্তি কীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করে, কীভাবে অনলাইন ও অফলাইনে কুতথ্য ছড়ায় তা আপনারা বুঝতে পারেন।

অনলাইন কুতথ্য ও প্রথাগত সুশীল সমাজ

গণতন্ত্র-ঘাটতি, জাতি বা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের নামে সহিংসতা ও ঘৃণা প্রচার, উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, নারী-বিদ্বেষ, আদিবাসী-বিদ্বেষ, সর্বোপরি মানবাধিকারের সকল ধরণের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজ কাজ করে। আজকের দিনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, পরিবেশরক্ষা, সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তার মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য সুশীল সমাজের অসংখ্য সংগঠন সারা পৃথিবীতে কাজ করছে। সামাজিক মূলধন (Social capital) ও সামাজিক বুনন রক্ষায় কাজ করে সুশীল সমাজ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, প্রথাগত সুশীল সমাজ ধারণাটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রেখেছি। কিন্তু, মানুষের সচেতনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে এমন এনজিওদেরও অনলাইন কুতথ্য বা অনলাইন কুতথ্য প্রতিরোধে সুশীল সমাজের শক্তিশালী একটি অংশ হিসেবেই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

আমরা জানি, আজকের দিনে কুতথ্যের প্রধান বাহন হচ্ছে ইন্টারনেট। স্বভাবতই নানামুখী অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সুশীল সমাজের যথেষ্ঠ মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠা এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে কুতথ্য উৎপাদক শক্তি যেভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কুতথ্য তৈরি করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিতরণ করে চলেছে তা প্রতিহত করতে সুশীল সমাজ হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। তারাই নিজের নিজের

এলাকাতে সামনের দিনগুলোতে এক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে নেতৃত্ব দেবেন বলে আমরা আশাবাদী।

এক্ষেত্রে শুধু মনে রাখতে হবে যে, করণীয়গুলো আগের মতই হচ্ছে, শুধুমাত্র কাজের ধরণে কিছু পরিবর্তন আনাটা দরকারি হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো (সভা-সমিতি-সেমিনার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচি, মানববন্ধন, র‍্যালি ইত্যাদি) যথারীতি চলবে। একই সাথে ইন্টারনেটের দুনিয়াতেও সুশীল সমাজকে অগণতান্ত্রিক, অনুদার, ঘৃণাবাদী, হিংসাশ্রয়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক অপশক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে।

আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র অবশ্যই অনলাইন কুতথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় সচেষ্ট থাকবে। একই সাথে মনে রাখতে হবে যে, ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, কোন একটি বিষয়ে যদি সমাজের মধ্যে চাহিদা থাকে, সেক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায় না। অতএব সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও সহিংসতায় উসকানিমূলক অনলাইন কুতথ্য নিরূপন বা অনলাইন কুতথ্য প্রতিরোধে দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের হতে পারে না। এক্ষেত্রে সমাজের সচেতন অংশ তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের অনেক বড় ভূমিকা আছে। সুশীল সমাজের সমন্বিত প্রতিরোধ ছাড়া অনলাইন কুতথ্য বা অনলাইন কুতথ্যকারীদের প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

অপসংস্কৃতি

অপসংস্কৃতি কথাটি গোলমেলে। অনেকে বিদেশ থেকে আসা যেকোন সাংস্কৃতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডকে অপসংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করে বসেন এটা ঠিক নয়। বিদেশি হলেই অপসংস্কৃতি এটা সঙ্কীর্ণতা। আসলে এ ধরণের অবস্থানের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। যা কিছু আমাদের তার সব কিছু ভালো, এটা সত্য। আমরা ভালো ছিলাম, কিন্তু বিদেশী অপসংস্কৃতির কারণে আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি এগুলো খুব দুর্বল বক্তব্য। মোটকথা, অপসংস্কৃতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা দেশে-বিদেশে যেকোন স্থানে উৎপাদিত হতে পারে। যেমন, ঢাকার অনেক সিনেমায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নারীদেহের কুৎসিত ব্যবহার কি অপসংস্কৃতি নয়? নাকি আমরা বলবো যে, এসব নির্মাতা বিদেশি ছবি দেখে এসব শিখেছেন, তাই সব দোষ বিদেশি সিনেমার। এসব বক্তব্য, নিতান্ত হাস্যকর।

আমরা সারা বিশ্ব থেকে যা কিছু ভালো, চিরায়ত, মঙ্গলময় তা গ্রহণ করবো। আবার আমাদের যা কিছু ভালো তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো। দরজা বন্ধ করে

রাখার নীতি খুব খারাপ। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেহাই পাওয়া যায়না।

বাংলাদেশে উৎসব

বাংলাদেশে প্রধান উৎসব এখনো বিভিন্ন ধর্মের মানুষের নানা ধর্মীয় উৎসব। এর বাইরে রয়েছে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ, বিজু-বিহু-বৈসাবি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হয়।

ঈদের সময় একটি খবর সংবাদমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার করে। খবরটা হলো, হবিগঞ্জে ঈদের জামাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে ৬০ হিন্দু। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এটা কি মোক্ষম দৃষ্টান্ত নয়? এই ৬০ জন যুবকের মধ্যে কেউ আইনজীবী, কেউ চিকিৎসক, কেউ বা ছিল ছাত্র।

হবিগঞ্জ পূজা উদযাপন পরিষদের বিভাগীয় সম্পাদক শঙ্খ শুভ্র রায় জানান, ''আমরা একই শহরে বাস করি। দিনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সবার সাথে মিলে কাজ করতে হয়। তাই শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে তো আমরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারবো না।" এ বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ মো. আবু জহির বলেন, ''ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অসাধারণ উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে হবিগঞ্জে। এ উদ্যোগকে সবাই সমর্থন করেছেন। আমরা মুসলমানরাও দুর্গাপূজার সময় অনুরূপ দায়িত্ব পালন করছি।"

বাংলাদেশে দুর্গাপূজার শুরু হয়ে গেছে। আর এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আরেকটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি হয়েছে যশোরে। শহরের লালদীঘি এলাকার পূজামণ্ডপে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখভালের জন্যে ইতোমধ্যে হিন্দু যুবকদের পাশাপাশি মুসলিম যুবকরাও কাজ করছেন। মো. রায়হান সিদ্দিকী ময়নার নেতৃত্বে কাজ করছে ১৭ জন মুসলিম তরুণের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল। ময়নার ভাষায়, ''হিন্দু-মুসলিম হচ্ছে ধর্মীয় পরিচয়, কিন্তু আমরা সবাই তো মানুষ। তাছাড়া উৎসব হচ্ছে সর্বজনীন। তাই উৎসবে সবাই শামিল হবে, এটাই যে স্বাভাবিক।"

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর দাস রতনের কথায়, ''আমরা হিন্দু-মুসলিম...সকলে মিলে উৎসব ভাগ করে নিই। আমাদের নিরাপত্তায় মুসলিম যুবকরা এগিয়ে এসেছেন। ভবিষ্যতে আমরা আবারো তাদের পাশে দাঁড়াবো।"

ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরে রমজান মাসে গত ছ'বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়। রমজানের প্রতি সন্ধ্যায় প্রায় ৫০০ মানুষ লাইন ধরে ইফতার নেন, যা বিতরণ করেন ভিক্ষুরা। মন্দিরের প্রধান শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এটাকে দেখেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার কাজ হিসেবে।

সমাজে অনেক সংকট আছে। দেশে আছে অনেক দুর্বৃত্ত, যারা নানা বাহানায়, নানা অজুহাতে ধর্মীয় উৎসবে বিভেদ খোঁজে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়। তারপরও ওপরের দু'টি উদাহরণই বলে দিচ্ছে, এটাই বাংলাদেশ। এটাই বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা এবং চেতনার মূল সুর।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

মুসলমানদের প্রধান দু'টি ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ উল-আজহা। এর বাইরে মহরম অন্যতম। ঈদ উল-ফিতর অনেকটাই সর্বজনীন উৎসব। ঈদে পুরনো ঢাকায় যে আনন্দ মিছিল বের হয়, তাতে মুসলমান ছাড়াও সব ধর্মের মানুষ অংশ নেয়। ঐ শোভাযাত্রা অনেকটাই সামাজিক আনন্দ শোভাযাত্রায় পরিণত হয়েছে। ঈদে নতুন পোশাক পরার রেওয়াজ আছে। আসলে বাংলাদেশে একটা নতুন সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে আজকাল। তাহলো, ঈদের সময় যাদের সামর্থ্য থাকে, তা সে যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন, নতুন পোশাক কেনার চেষ্টা করে।

এছাড়া সব ধর্মের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় খাওয়ার আয়োজনে। ঈদ উল-আজহার চিত্র মোটামুটি একই। এই যেমন, সামর্থবান মুসলমানরা গরুর বাইরে অন্য পশুর মাংসেরও ব্যবস্থা রাখেন অন্য ধর্মের অতিথিদের জন্য।

বাংলাদেশে মহরমের তাজিয়া মিছিলের আয়োজন করে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। এটা কারবালার শোকাবহ স্মৃতিকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়। পুরনো ঢাকার হোসেনী দালান এলাকা থেকে সবচেয়ে বড় তাজিয়া মিছিল বের হয় এ সময়, যার দর্শনার্থী হয় সব ধর্মের মানুষ। মহরম উপলক্ষ্যে মেলা বসে হুসেনী দালান, বখশীবাজার, ফরাশগঞ্জ ও আজিমপুরে। সেই মেলাও সর্বজনীন।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী বা মহানবীর জন্মদিনেও বাংলাদেশের মুসলমানরা নানা আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে ঢাকায় জসনে জুলুস নামে রংবেরঙের পতাকাসহ একটি আকর্ষণীয় মিছিল বের হয়।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। তবে এই পুজো শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কারণ উৎসবে অংশ নেয় সব ধর্মের মানুষ। প্রতিমা দেখা, পূজার প্রসাদ খাওয়াসহ সব আয়োজনেই থাকে সবার অংশগ্রহণ। এমনকি প্রতিমা বিজর্সনের সময়ও সবাই অংশ নেয়। পূজা উপলক্ষ্যে বসে মেলা, কোথাও কোথাও আয়োজন হয় নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়ের। হয় নাটক, যাত্রাপালা ও গানের আসরের। এই সমস্ত আয়োজন সবাইকে এক করে। পূজার উৎসবকে আরো বেশি সর্বজনীন রূপ দেয় এসব আয়োজন।

বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসহ স্কুল কলেজের খোলা চত্বরে বিদ্যাদেবীর এই পূজাও এক সর্বজনীন আয়োজন। শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে এ আয়োজন সফল করে তোলে।

লক্ষ্মী পূজায়ও হিন্দুরা আমন্ত্রণ জানায় সব ধর্মের মানুষকে। ধনের দেবী লক্ষ্মীকে কেউই আসলে অবহেলা করতে চান না। তারপর আসে কালীপূজা, যা সর্বজনীন মণ্ডপে উদযাপন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীর মিছিল আরেকটি আকর্ষণ বাংলাদেশে। এই মিছিলের রঙে সবাই আকৃষ্ট হয়। আর দোলউৎসবে রং খেলায় মেতে ওঠে সবধর্মের তরুণ-তরুণীরা। এছাড়াও আছে রথযাত্রা, আছে চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্র সংক্রান্তি আবহমান গ্রাম বাংলায় একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের আগের দিন, অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে গ্রামে গ্রামে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দুদের চড়ক উৎসব নামে আরেকটি ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়। চড়কের সঙ্গে থাকে মেলা। চড়ক এবং মেলা দেখতে চড়ক এবং মেলা দেখতে সবধর্মের মানুষই ছুটে যায়।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব

বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধদেবের জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, নির্বাণ সবই বৈশাখী পূর্ণিমায় ঘটেছিল, তাই এ উৎসব বৌদ্ধদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এছাড়া বৌদ্ধদের প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর আকর্ষণ এড়াতে পারে না কোনো ধর্মের মানুষই। কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে প্রবারণা পূর্ণিমায় সব ধর্মের মানুষ মিলে ফানুস ওড়ায়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে প্রবারণা পালিত হয়।

আর এই উৎসব শেষ হওয়ার পর প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে পালিত হয় কঠিন চীবর দান উৎসব।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব

খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ক্রিসমাস বা বড়দিন। যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব এখন বাংলাদেশে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। তাই গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা, ভোজসভা এবং উপহার বিতরণে সব ধর্মের মানুষই অংশ নেয়। ঢাকার বড় বড় হোটেলে থাকে বড়দিনের বিশেষ আয়োজন। সাজানো হয় ক্রিসমাস ট্রি, থাকে সান্টাক্লসও। শিশুরা স্যান্টাক্লসের কাছ থেকে উপহার পেতে চায়। বাবা-মা তাদের শিশুদের নিয়ে সেখানে যান তাদের আনন্দ দিতে। অন্য ধর্মের কেউ কেউ ঘরেও ক্রিসমাস ট্রি সাজায়। এছাড়া ইস্টার সানডেও পালিত হয় কোথাও কোথাও।

আদিবাসীদের উৎসব

বাংলাদেশের আদিবাসীরা পাহাড়ে বাংলা নববর্ষে 'বৈসাবি' উৎসব পালন করে। এটাও সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি আদিবাসী সমাজের বর্ষবরণ উৎসব এটি।

ত্রিপুরাদের কাছে বৈসুক বা বৈসু, মারমাদের কাছে সাংগ্রাই এবং চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে বিজু নামে পরিচিত। বৈসাবি নাম হয়েছে এই তিনটি উৎসবের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে। বৈসাবি উৎসবে অংশ নিতে সারাদেশ থেকে উৎসাহীরা যান পার্বত্য চট্টগ্রামে। এছাড়া আছে উত্তরবাংলায় কারাম উৎসব ও গারোদের ওয়ানগালা।

এছাড়া ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের মর্সিয়া, কাসিয়া, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দে হিন্দুদের অষ্টমী স্নান, মৌলভীবাজারের মাধবপুর ও সুন্দরবনের দুবলারচরে রাসউৎসব ধর্মীয় সর্বজনীন উৎসবের উদাহরণ।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন ডয়চেভেলেকে বলেন, ''বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য হলো ধর্মকে যার যার জায়গায় রেখে উৎসবকে ভাগাভাগি করে নেওয়া। বাগেরহাটে পূজা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ৬৫জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৬০ জনই মুসলমান। প্রতিমা দেখার একটা ঐতিহ্য আছে আমাদের। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই প্রতিমা দেখছেন। অংশ নিচ্ছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তেমনি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবেও অংশ নেন সব ধর্মের মানুষ।"

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রানা দাশগুপ্ত ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''যে যার ধর্ম আচারনিষ্ঠভাবে পালন করেন। কিন্তু উৎসব ভাগাভাগি করে নেন। পূজা অথবা ঈদ-কোরবানি দু'টোতেই আমরা তা দেখে আসছি। কোনো কোনো গোষ্ঠী মাঝে মাঝে তাদের স্বার্থে এই সম্প্রীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় বা নিয়েছে এ কথা সত্য। কিন্তু তারা শেষপর্যন্ত সফল হয় না। কারণ এখানে ধর্মের সঙ্গে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।"

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, ''ইবাদত-পূজা আর উৎসব এ দু'টোকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ইবাদত ও পূজার বাইরে যে উৎসব, তা তো সবার। এটা মানবিকতা। আমরা সব ধর্মের মানুষ, আমাদের উৎসবে পরস্পরকে আপন করে নেবো এটাই

তো ধর্মের শিক্ষা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যও তাই। কিন্তু কেউ কেউ দু'টি বিষয়কে যখন গুলিয়ে ফেলেন, তখনই সমস্যা হয়।"

এই তিনজনই মনে করেন, অপশক্তি কখনোই সফল হবে না। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসবের যে সর্বজনীন ঐতিহ্য, তা ম্লান করা যাবে না কখনোই।

খেয়াল করলে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতেই বিপুল সংখ্যক অনলাইন কুতথ্যের মধ্যে একটি বড়সংখ্যক অনলাইন কুতথ্য হচ্ছে আত্মপরিচয় (Identity) ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতিজনিত (Identity politics) অনলাইন কুতথ্য।

আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি বুঝতে পারলে অনলাইন কুতথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা বোঝা সহজ হবে। আর অনলাইন কুতথ্যের উৎপাদক, ভোক্তা, সরবরাহকারীদের বড় একটি অংশকেও আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো।

"আমি", "আমরা" এবং "ওরা"

আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়া দরকার। "আমি" কে? "আমরা" বলতে কি বোঝায়? "আমরা" বনাম "ওরা" কিভাবে নির্ণয় হয়?

একজন ব্যক্তির সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে তার মানুষ পরিচয়। হতে পারে তার জাতিগত, ধর্মীয়, পেশাগত, অঞ্চলগত বা এলাকাগত এবং লিঙ্গীয়সহ অনেক রকমের পরিচয়। আসল কথা কোন পরিচয় বা পরিচয়গুলি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
যেমন, কেউ একজন বলতে পারেন যে, আমি সবার আগে একজন নারী, তারপরে একজন যশোরবাসী বা নেত্রকোনাবাসী, তারপরে একজন চাকরিজীবী। আবার কেউ বলতে পারেন আমি সবার আগে একজন মুসলিম, তারপর একজন বাঙালি, তারপর একজন পুরুষ। অন্য আরেকজন বলতে পারেন আমি সবার আগে বাঙালি, তারপর মুসলিম, তারপর মানুষ।

পরিচয়ের পছন্দগুলো হতে পারে মুসলিম-বাঙালি-পুরুষ/নারী; বাঙালি-মুসলিম-মানুষ। হতে পারে নারী-হিন্দু-মানুষ। একজন মানুষের নানারকম পরিচয় হতে পারে।

একজন মানুষের নানারকম পরিচয় থাকতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। তার মানে একজন মানুষের শুধুমাত্র একটি পরিচয় হতে পারেনা। এর মধ্যে কোন একটি পরিচয় বেশি আবার কোন একটি পরিচয় কম গুরুত্ব পেতে পারে ব্যক্তির কাছে। কিন্তু মানুষ কোনভাবেই একটিমাত্র পরিচয়বিশিষ্ট প্রাণী নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই অস্বাভাবিকতাই বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিকতা হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে, মানুষের একটিমাত্র পরিচয় দিয়ে অন্য সকল পরিচয়কে বিলীন করে দেয়ার একটা ভয়াবহ চেষ্টা চলছে নানা দেশে নানা সমাজে।

এক্ষেত্রে সবার আগে আসবে ধর্মভিত্তিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়াতে যে রাজনীতি গড়ে উঠেছে তার কথা। ধর্মীয় উগ্রবাদীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য একজন মানুষের অন্য সকল পরিচয়কে ঢেকে দিতে চায়। তারা চায় মানুষে-মানুষে মিল অথবা অমিল হবে ধর্মের ভিত্তিতে। তারা মানুষের সংখ্যা বিচার করে ধর্মের ভিত্তিতে। তারা মানুষকে শত্রু ও বন্ধু জ্ঞান করে ধর্মের ভিত্তিতে। আজকাল ধর্মের ভিত্তিতে "আমি", "আমরা" এবং "ওরা" নির্ধারণের প্রবনতা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। এই "আমরা" ভিন্ন ধর্মকে "ওরা" তথা "অন্য, "খারাপ", "ষড়যন্ত্রকারী" "শত্রু" এবং "শাস্তি যোগ্য" হিসাবে চিত্রিত করে।

কোন স্থানে জাতিসত্তার ভিত্তিতে এধরণের অসুস্থতা দেখা গেলেও, আজকের পৃথিবীর অনেকে স্থানেই শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয় এবং আত্মপরিচয়ের রাজনীতির কারণেই গণতন্ত্র, সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতাবিরোধী সঙ্কট দেখা দিচ্ছে।

শুধু ধর্মের চোখ দিয়ে দেখলে ধুতি পরা মানুষটিকে কেবল হিন্দুই মনে হবে। অন্যদিকে আলখাল্লা পরা দুই তরুণকে মনে হবে শুধুই মুসলিম। কিন্তু এই কি এদের একমাত্র পরিচয়? এদের জাতিগত, পেশাগত থেকে নানাবিধ পরিচয় রয়েছে।

ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের বিষবাষ্পে উপমহাদেশ ভাগ হয়েছে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে আছে। ভারতে গত বেশ কিছু দিন ধরে হিন্দুত্ববাদীদের প্রবল আস্ফালন চলছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে দেখানোর রাজনীতি শুরু হয়।

ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতির কারণে মুক্তচিন্তা, লিঙ্গীয় সমতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে নিজের মত করে জীবন যাপনের স্বাধীনতার অধিকার অনেক দেশে অনেক সমাজেই ক্ষুন্ন হচ্ছে।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নাগরিকদের একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে এই নেতিবাচক প্রবণতা থেকে এলাকা তথা দেশকে রক্ষা করা। স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধের পাশাপাশি, যাতে ইন্টারনেটের দুনিয়াতে ধর্মভিত্তিক অনলাইন কুতথ্য কারীদের প্রতিরোধ করতে পারা সম্ভব হয়।

কোন স্থানে জাতিসত্তার ভিত্তিতে এধরণের অসুস্থতা দেখা গেলেও, আজকের পৃথিবীর অনেকে স্থানেই শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয় এবং আত্মপরিচয়ের রাজনীতির কারণেই গণতন্ত্র, সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতাবিরোধী সঙ্কট দেখা দিচ্ছে।

শুধু ধর্মের চোখ দিয়ে দেখলে ধুতি পরা মানুষটিকে কেবল হিন্দুই মনে হবে। অন্যদিকে আলখাল্লা পরা দুই তরুণকে মনে হবে শুধুই মুসলিম। কিন্তু এই কি এদের একমাত্র পরিচয়? এদের জাতিগত, পেশাগত থেকে নানাবিধ পরিচয় রয়েছে।

ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের বিষবাষ্পে উপমহাদেশ ভাগ হয়েছে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে আছে। ভারতে গত বেশ কিছু দিন ধরে হিন্দুত্ববাদীদের প্রবল আস্ফালন চলছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে দেখানোর রাজনীতি শুরু হয়।

ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতির কারণে মুক্তচিন্তা, লিঙ্গীয় সমতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে নিজের মত করে জীবন যাপনের স্বাধীনতার অধিকার অনেক দেশে অনেক সমাজেই ক্ষুন্ন হচ্ছে।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নাগরিকদের একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে এই

অনলাইন কুতথ্য শুরু করলে কি করবেন?

এটা খুব স্বাভাবিক যে, নাগরিকরা যখন সক্রিয় হবেন তখন ধর্ম/জাতিভিত্তিক অনলাইনে কুতথ্য রটনাকারীরা চুপচাপ বসে থাকবে না। ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকারীরা শুরুতেই তাদের নিজ-ধর্ম বিদ্বেষী এবং অন্য-ধর্মের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রচারণা শুরু করতে পারে। যারা এদের আরেকটি কৌশল হচ্ছে মিথ্যাচারের মাধ্যমে সম্প্রীতিপন্থীদের চরিত্রহনন। এপন্থা অবলম্বন করে এরা মানুষকে সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে। জাতিভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসত্তার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন বলে অনলাইন কুতথ্য শুরু করতে পারে।

আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকারী এই শক্তিটি অত্যন্ত সংগঠিত এবং অর্থ-বিত্তে বলীয়ান। এরা বেশিরভাগ সময় একযোগে উদারতাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির উপরে হামলা চালায়।

ধর্মীয় বা জাতিভিত্তিক আত্মপরিচয়ভিত্তিক চিন্তা ও কাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করা খুব জরুরি। মনে রাখবে হবে যে, এই অপশক্তি মোকাবেলায় সম্প্রীতি, বহুত্ববাদ, মানবাধিকার তথা উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য জরুরি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত থেকে ধর্মভিত্তিক/ জাতিভিত্তিক আত্মপরিচয়ের প্রচারকারীদের ঠেকানো সম্ভব হবেনা। এদের দিক থেকে আসা অনলাইন কুতথ্য বা অনলাইন কুতথ্য ঠেকাতে হলে সবাই মিলে একযোগে অনলাইন জগতের লড়াইটি করতে হবে। একই সাথে স্থানীয় পর্যায়েও এই অপশক্তিকে একযোগে মোকাবেলা করতে হবে।

ধরা যাক, কোন একসময় স্থানীয় পর্যায়ের অনলাইন কুতথ্যকারীরা কোন একজনকে টার্গেট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইন কুতথ্য শুরু করেছে। তারা জনাব ক'কে নিজ-ধর্ম বিদ্বেষী এবং অন্য-ধর্মের স্বার্থের রক্ষক হিসাবে চিহ্নিত করে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি তারা স্থানীয় পর্যায়েও জনাব ক'-এর বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে খেপিয়ে তুলছে। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

- প্রথম করণীয় হচ্ছে জনাব ক'এর বিরুদ্ধে অনলাইন কুতথ্য প্রথমে যার চোখে পড়বে, তিনি কোনরকম দেরি না করে প্রথমে ক'কে ফোন করে কুতথ্যটি দেখতে বলুন এবং তাকে সাহস দিন।

- এবার কোন ধরণের দেরি না করে নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গ্রুপ-কল করুন। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করুন। যত দ্রুত সম্ভব সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ের জন্য কর্মপন্থা ঠিক করুন।

- জনাব ক'এর বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে তার পালটা বক্তব্য ড্রাফট করুন।

- যে প্লাটফর্ম থেকে অনলাইন কুতথ্যটি আপলোড করা হয়েছে সে প্লাটফর্মে আপনাদের কনটেন্টটি আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আপলোড করুন। একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোন স্থানে জমায়েত হতে থাকুন।

- অনলাইন কুতথ্যকারীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করে নিন এবং পরিস্থিতির জন্য সজাগ থাকুন। যে কোন প্রতিক্রিয়া আসা মাত্র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বা সামনা-সামনি সবাই মিলে কথা বলুন এবং আপনাদের জবাব প্রস্তুত করুন।

- এই জবাব সোশ্যাল মিডিয়ায় যার যার একাউন্ট থেকে নিজ-নিজ ভাষাভঙ্গিতে প্রকাশ করুন। এমনভাবে কাজটি করুন যাতে করে আপনারা সবাই যে এক গ্রুপের লোক তা বোঝা না যায়।

- ভাষার ক্ষেত্রে সতর্ক ও কৌশলী হবেন। ধর্মীয় আত্মপরিচয়ভিত্তিক অনলাইন কুতথ্যকারীরা ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করে তাদের কার্যসিদ্ধি করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে একই পরিভাষা ব্যবহার করা যায় কিনা চিন্তা করুন। ধরা যাক, তাদের ইসলামের মূল চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইসলাম-বিরোধী শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা! তাদের চিন্তাধারাকে "বাতিল" চিন্তা-ধারা আখ্যা দেয়া। অন্যান্য ধর্ম ব্যবহার করা অনলাইন কুতথ্যকারীদের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নেয়া যায় কিনা চিন্তা করুন।

- এ ধরণের পরিস্থিতিতে গড়িমসির কোন সুযোগ নেই। এ ধরণের পরিস্থিতিতে একটি মিনিটও অনেক মূল্যবান। কেননা অনলাইন কুতথ্যকারীরা দিন-তারিখ-সময় হিসেব করে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও স্থানীয় পর্যায়ে

একযোগে সক্রিয় হয়। অতএব সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশ হয়ে আপনাদের সময় হিসেবে তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে। তৎপরতার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মনিরপেক্ষতা তাত্ত্বিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকেরা, রাজনীতি, সরকারি ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সঙ্গে ধর্মের বিচ্ছেদের কথা বলে থাকেন। তা না হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং একই ধর্মের ভেতরের সংখ্যালঘু ধারাগুলোর প্রতি সমান গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া যায় না। এটি গণতন্ত্রের মূল বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংখ্যাগুরুর ধর্মের বিধান অনুসারে সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালিত হলে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে এ প্রশ্নের উত্তর ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধীদের কাছে নেই। ধরা যাক, ধর্মীয়ভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহলে দেশটির মুসলিমসহ বিপুল সংখ্যক অ-হিন্দু জনগোষ্ঠীর অবধারিত ও অলিখিতভাবে হলেও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়ে যাবে।

এছাড়া সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মের ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা কোন বাধা-নিষেধের কথা বলে না। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতার পক্ষে-বিপক্ষে কোন অবস্থান নেয় না। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মপালন এবং ধর্ম পালন না করার বিষয়টিকে ব্যাক্তির এখতিয়ারভূক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে।

অনলাইন কুতথ্য প্রচারকারীরা কী করে

অনলাইন কুতথ্য প্রচারকারীরা

- এই সত্যগুলোকে বিকৃত করে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসাবে প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

- অনলাইন কুতথ্য কারীরা ধর্মনিরপেক্ষকতাকে নাস্তিকতা হিসাবে প্রচার করে।

- অনলাইন কুতথ্য প্রচারকারীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের বিরুদ্ধে (যেমন, বাংলাদেশে ইসলাম, ভারতে হিন্দু ধর্ম) চক্রান্ত হিসাবে প্রচার চালায়। তারা ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার একটি আবহ তৈরি করে।

জেন্ডার

আমাদের জেন্ডার সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। নারী ও পুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতিই হচ্ছে জেন্ডার, যা নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে। শারীরিক কিছু পার্থক্য নিয়ে নারী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি যখন এই পার্থক্য এবং অন্যান্য কারণে তাদের ওপর নানা অর্থ নির্মাণ ও দায়দায়িত্ব আরোপ করে আলাদা করে ফেলে, তখনই তা হয়ে ওঠে জেন্ডার। তাই জেন্ডার এক ধরনের সামাজিক নির্মাণ। অন্যদিকে, শারীরিক পার্থক্যকে বলা হয় 'সেক্স'। এই পার্থক্য জৈবিক বলে তা দূর করা যায় না। কিন্তু সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়, দায়দায়িত্ব পরিবর্তন করা যায়। নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য দূর করে জেন্ডারবান্ধব সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। নারী ও পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত সংজ্ঞাই হচ্ছে জেন্ডার। প্রকৃতি ছেলে ও মেয়েশিশু তৈরি করে; সমাজ তাদের বৈষম্যের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীতে পরিণত করে। সমাজই তৈরি করেছে পুরুষালি ও মেয়েলি বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি বৈষম্য তৈরি করে নি, তৈরি করেছে নারীর পুনরুৎপাদনমূলক (রিপ্রোডাকটিভ) কাজের জন্য বিশেষায়িত অঙ্গ। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য, উচ্চ-নিচ, কালোসাদা, নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য ও ব্যবধান তার সবই সমাজের তৈরি। জেন্ডার বৈষম্যের মাশুল শুধু নারীকেই দিতে হয় না, পুরুষ এবং সাধারণভাবে সমাজকেও দিতে হয়।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার বা লিঙ্গ সংবেদনশীল এবং লিঙ্গবান্ধব হওয়া দরকার। লিঙ্গ বৈষম্য এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাজে স্পষ্ট করার কারণে এখন লিঙ্গ সচেতনতা আরও বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক। লিঙ্গ কীভাবে সমাজে নারী ও পুরুষের বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা রাখে এবং কীভাবে এটি তাদের মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তার ভূমিকা কী তা রূপ দেওয়ার জন্য এটি একটি প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করার অন্যতম সেরা কৌশল হলো সমাজের সকল স্তরে লিঙ্গ সচেতনতা প্রচার করা। সহজভাবে বললে শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে কাউকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত না করা এবং ছেলে হওয়ার কারণে বাড়তি সুবিধা না দিয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ ও মর্যাদা দেওয়ার মনোগঠন তৈরি ও তার চর্চার সংস্কৃতিই হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওসমাজে নারী ও পুরুষ একইরকম দায়দায়িত্ব পালন করবে, একইরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিনিময়ে একই মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে- এটাই প্রত্যাশিত। এ বিষয়টি মনে রেখে ও গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি কাজে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলা হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে নানাভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য দেখা যায়। শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি-বাকরি, অভিজ্ঞতা, মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, নেতৃত্ব প্রদান, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান ইত্যাদি সকল দিক থেকেই নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এ অবস্থা মোটেও কাম্য নয়। তাই পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়োগ, কর্মবণ্টন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

নারী-পুরুষ বা ছেলে-মেয়ে উভয়কে নিয়েই আমাদের সমাজ। সমাজে নারী-পুরুষের সামর্থ্য-যোগ্যতা এক হলেও উভয়ের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা যদি উভয়ের জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তাহলে উভয়েই তাদের সেরাটা দিতে পারে। তাহলে সমাজের অনেক বেশি কল্যাণ হয়। এই বোধ ও মনোভাবই হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা।

অসংবেদনশীলতা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বলা চলে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা ছোট আকারের সমাজ। সমাজে যা কিছু পক্ষপাত, বৈষম্য, তার প্রতিফলন পড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম, আলাদা খেলাধুলার সরঞ্জাম, ছেলেদের দিয়ে মাঠ পরিষ্কার, মেয়েদের দিয়ে ক্লাসরুম ঝাড়ু দেওয়া, এমন নানা ধরনের বিভাজন চলতে থাকে। এই বিভাজনকে 'সমস্যা' না ভেবে 'স্বাভাবিক' ভাবতেই অভ্যস্ত অধিকাংশ শিক্ষক। অনেকে মুখে বলেন, 'আমি ছেলে-মেয়েতে পার্থক্য করি না', কিন্তু মেয়ে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ চাইলে তা কিনে দেওয়া হয় না। বড়জোর দেওয়া হয় গয়না বা পোশাক। সমাজের অভ্যাস প্রভাবিত করে বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও শৈশব-কৈশোরেই এই পার্থক্যের বোধ ঢুকে যায়। সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে, এমন এক ছাত্র ও ছাত্রীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন শিক্ষক। ছেলেটি স্পষ্ট বলে, 'তাতে কী স্যার! আমি তো ছেলে।' অন্যদিকে, মেয়েটি কেঁদে ফেলে এবং কাউকে না জানানোর অনুরোধ করতে থাকে বারবার। এভাবেই স্কুল-কলেজে জেন্ডার নির্মাণ চলতে থাকে।

এমনটাই কি চলবে? বৈষম্যের ধারাপাতে মেয়েরা কি আত্মপ্রত্যয়হীন, বিষাদগ্রস্ত হয়েই বাঁচবে? ছেলেরা নিজেদের 'হিরো' ইমেজ নিয়ে ঘুরবে চিরকাল? নাকি শিক্ষায়, স্কুলের পরিবেশে পরিবর্তন আসবে? জেন্ডার-বৈষম্যের যে বীজ প্রোথিত আছে সিলেবাসে, স্কুলের ব্যবহারিক বিধিতে বা প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসে, তাকে সমূলে নাশ করবার ব্যাপারে আলোচনায় সবাই একমত হন। কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব তা নিয়ে ভাবনা বিশেষ এগোয় না। পাঠদানে পরিবর্তন, নতুন নতুন পাঠ্যবই বা 'অ্যাক্টিভিটি'-মূলক পাঠ, শিক্ষকদের নিয়ে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা, ক্লাসে জীবনশৈলী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা কোনটা কাজে দেবে বেশি? এসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়; কিন্তু নতুন পথে হাঁটা তো দরকার। সেই কাজটা আজকের প্রজন্মকেই শুরু করতে হবে। পুরুষের তৈরি নিয়মনীতির জেরে নারীরা বঞ্চিত। সমাজের বেশিরভাগ নিয়মনীতি তৈরি করে পুরুষরা। যারা তৈরি করে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থেই করে বলে জেনেশুনে বা অগোচরে নারীর বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ এতে তাদের সুবিধে হয়; যেমন, পুরুষরা কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে বিভাজন তৈরি করেছে। রান্নাবান্না ও ঘর-গেরস্থালির কাজকে বলা হয়েছে মেয়েদের কাজ। পুরুষরা হাট-বাজারে যাবে, আড্ডা দেবে, চা-পানি খেয়ে আমোদ করবে। এই কাজগুলো মেয়েরা করলে পুরুষরা চটে যায়।

সমাজের নিয়মনীতিগুলো পুরুষরা তৈরি করেছে বলে এই নিয়ম অনুযায়ী ছেলেরা কী করবে, মেয়েরা কী করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আমরা অবাক হই। অনেক ক্ষেত্রে এর প্রতিবাদও করি। কারণ পুরুষের তৈরি নিয়মনীতিতে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, নারীকে দেখি পুরুষের চোখ দিয়ে, পুরুষের তৈরি রীতিনীতির আলোকে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

নারীর পোশাকে পকেট নেই কেন?

দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের বেশিরভাগের পোশাক হয় শাড়ি, নয় তো সালোয়ার-কামিজ। শাড়ি আর সালোয়ার-কামিজে পকেট থাকে না। পক্ষান্তরে পুরুষের পোশাক শার্ট, প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, যার প্রতিটিতেই পকেট থাকে। কেন পুরুষের পোশাক পকেটযুক্ত আর নারীর পোশাক পকেটহীন? কারণ, 'পকেট' মানে 'অর্থ'। পুরুষের তৈরি সমাজ কাঠামোয় এ সত্য নির্মাণ করা হয় যে, টাকাপয়সা, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের 'অর্থনৈতিক এলাকা' কেবল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাই পুরুষ নারীর পোশাক থেকে পকেট 'নাই' করে দিয়েছে, যাতে অর্থের ওপর নারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ তৈরি না হয়। পুরুষের টাকা এত বেশি যে পকেটে কুলায় না, উপচে পড়ে; এ জন্য তার বাড়তি মানিব্যাগ দরকার। 'মানিব্যাগ'। এ

প্রত্যয়টি আবারও 'মানি' বা 'অর্থ' বা 'অর্থনীতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে, মেয়েদেরও একটি ব্যাগ থাকে, যার নাম মানিব্যাগ নয়, ভ্যানিটি ব্যাগ। বাংলা একাডেমির অভিধানে ভ্যানিটি ব্যাগের বাংলা করা হয়েছে 'প্রসাধনপেটিকা। ছোট আয়না, প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি রাখার জন্য ক্ষুদ্র থলে...'। এতেই বোঝা যায় যে, কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নারীর পোশাক ও অভিধান দুটোই পুরুষদের ইচ্ছেমাফিক তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পুরুষরা তার মনগড়া রূপ, সৌন্দর্য আর প্রসাধনের মতো তুচ্ছ কাজে নারীকে আটকে রাখতে চায়। অথচ কে না জানে, এক গার্মেন্টস খাতেই ৪০ লাখের বেশি নারী কাজ করে। নারী সরকার প্রধান, সংসদের স্পিকার, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য, রাষ্ট্রদূত, নির্বাচন কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সচিব-যুগ্মসচিব, সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং উড়োজাহাজ ও ট্রেনের চালক। চিকিৎসক, অধ্যাপক, প্রকৌশলী তো নারীদের মধ্যে হাজারে হাজার। কাজেই সময় এসেছে পুরুষের তৈরি পোশাকের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার; পকেট সংযুক্ত করে নারীর পোশাকে অর্থনীতির নতুন মাত্রা যোগ করা আর পুরুষতান্ত্রিক ব্যাকরণ পালটে ফেলার।

মোটরসাইকেল : কেন দুই পা এক দিকে?

মোটরসাইকেলে প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ বাইক চালাচ্ছে আর মাঝখানে সন্তানকে রেখে নারী পেছনে বসে পথ চলছে। কোনো পুরুষ যখন বাইকের পেছনে বসে, তখন দুই পা দুই দিক দিয়ে বসে। এটাই বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ বসার ভঙ্গি। কিন্তু নারীকে দুই পা একই দিকে দিয়ে বাইকের পেছনে বসতে হয়। বসার এ ভঙ্গি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। কেন নারীরা এভাবে বসে? আসলে নারীর এই বসার ভঙ্গিটিও ঠিক করে দিয়েছে পুরুষবাদি দোষে দুষ্ট সমাজ। পুরুষ মনে করে, নারীর দুই পা দুই দিক দিয়ে বসা 'শোভন' দেখায় না; পুরুষের চোখে নারীর বসার এ ভঙ্গিটি অশ্লীল, সাহসী ও দম্ভপূর্ণ। পুরুষরা নারীর এসব বৈশিষ্ট্য মেনে নিতে নারাজ, যে কারণে তারা নারীর বাইকের পেছনে বসাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে দেয়। তবে সময় পালটাচ্ছে। আজ অনেক নারী মোটরসাইকেল বা স্কুটি চালিয়ে অফিসে যান। অনেক নারী এখন রাইডার হিসেবে অ্যাপভিত্তিক মোটরসাইকেলও চালান। তারা হামেশাই পেছনে যাত্রী বসাচ্ছেন। অনেকে পেছনে সন্তান, আত্মীয় বা ভাইকেও বসাচ্ছেন। এভাবে সমাজের বেঁধে দেওয়া নারী-পুরুষের গতানুগতিক ভূমিকার বদল হচ্ছে। নারী এখন 'পেছনের যাত্রী' থেকে 'সামনের চালক'। কে না জানে, চালকের আসনে বসলে দুই পা এক দিকে দেওয়া যায় না, দুই দিকেই দিতে হয়।

আমাদের দেশের মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার। আমাদের কিশোরী মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পথে তারই বয়সী আরেক কিশোর দ্বারা উত্ত্যক্ত হচ্ছে। এরকমই এক

ঘটনার প্রতিবাদ করায় কিশোরীর মায়ের গায়ে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়ার মতো ঘটনারও সাক্ষী হতে হয়েছে আমাদের। মেয়েশিক্ষার্থীদের ঝরেপড়ার পেছনে যৌন হয়রানি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েশিক্ষার্থীদের জন্য এটা জীবন ঝুঁকিও তৈরি করছে। মেয়েরা পথেঘাটে, বিদ্যালয়ে, মোবাইল ও ফেসবুকে, সর্বোপরি ভার্চুয়াল জগতে যৌন নিগ্রহ ও নিপীড়নের শিকার হয়। এক শ্রেণির পুরুষ টিজিং, আপত্তিকর টেক্সট মেসেজ, নোংরা ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে মেয়েদের হয়রানি করে। এর ফলে অনেক মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কেউ আবার দুঃসহ সামাজিক ট্রমাতে ভুগছে। এ পরিস্থিতিতে অনন্যোপায় হয়ে অনেক অভিভাবক কিশোরী মেয়েদের পড়ানো বন্ধ করে দিচ্ছে বা অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি হলেও শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা সুরক্ষা করে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা মানুষকে মানবিক মানসম্পন্ন আচরণ শেখায়। জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ বজায় থাকলে তা যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত অবস্থায় উন্নীত হতে সহায়তা করে। তাই এটি বাংলাদেশের উন্নয়নেরও মূলমন্ত্র।

শ্রেণিবিন্যস্ত আর বৈষম্যমূলক এ সমাজকাঠামোয় পুরুষও নানা বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার, কিন্তু সমাজকাঠামোর প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান আরও নিচে, আরও প্রান্তে। যে কোনো বৈষম্যের প্রথম শিকার হয় নারী; সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেও নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এ কাঠামোটি টিকিয়ে রাখতে চায় বলে এ কাজে পরিবার, আইন কিংবা সমাজের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ভূমিকা রাখে। পাঠ্যপুস্তকে তাই নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ দেখি; নারীর অধস্তন, দুর্বল, অসহায় আর নির্ভরশীল রূপটি দিনের পর দিন পুনরুৎপাদিত হতে দেখি। এভাবে জেন্ডারের সামাজিকীকরণে পাঠ্যপুস্তক যে ভূমিকা রাখছে, তার ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী। দরকার নারীর গতানুগতিক ও অধস্তন অবস্থানের বিপরীতে পাঠ্যপুস্তকে নারীর ইতিবাচক, মানবিক, প্রগতিশীল, সক্ষম ও আধুনিক ইমেজ তুলে ধরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেন নারী প্রধান টার্গেট

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া চলা যেন কঠিন হয়ে পড়ছে অনেকের কাছে।

প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুবে থাকেন বেশিরভাগ তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সের অনেকেই। এতে অনেকেই উপকৃত হন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্ষমতাহীন ব্যবহারে ক্ষতি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে অনেকেই করছেন অসামাজিক কার্যকলাপ। বিশেষ করে ফেসবুকের মাধ্যমে নারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ফেসবুকের এ জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটি চক্র মেতে উঠেছে নানা অসামাজিক কার্যকলাপে। বিভিন্ন পোস্ট দিয়ে, নোংরা ছবি-ভিডিও আপলোড করে নারীদের হয়রানি, গুজব ও ধর্মীয়বিদ্বেষ ছড়ানো, প্রশ্নফাঁসসহ গুরুতর অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ফেসবুক। শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যাপ ফেসবুক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের মাসিক সক্রিয় সদস্য ২০০ কোটি। এর একটা সিংহভাগ নারী সদস্য। আর এই নারী সদস্যদের অনেকেই হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

দেশে অনলাইন ব্যবহারকারী ৭০ শতাংশ নারীই কোনো না কোনো ধরনের হয়রানির শিকার বলে এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়। শুধু দেশই নয়, বিশ্বজুড়ে অনলাইনে নারী হয়রানির এমন ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার নিরাপত্তা শাখার তথ্যমতে, তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিচরণের কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ভূমিকা রাখছে আবার এসব মাধ্যমে নারী হয়রানির ঘটনাও বাড়ছে। পুলিশের দাবি, অভিযোগকারীদের প্রায় ৯০শতাংশ ক্ষেত্রেই সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট থেকে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে।

অনলাইন ব্যবহারকারীর প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরি। প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করা হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের হয়রানি কমবে। পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিৎ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছেন টিনএজ নারীরা। এ বয়সের একটি আবেগ থাকে। তাই তারা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিও তুলছেন। বন্ধুরা সে ছবি ফেসবুক বা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে তাকে হয়রানি বা ব্লাকমেইল করছে। এজন্য বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। হয়রানির শিকার নারীদের আইনি সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

গল্প-গুজবের সাংবাদিকতা

মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যার পর আলোচনায় 'গল্প-গুজবের' সাংবাদিকতা। আর গল্প দোষে দুষ্ট এই প্রতিবেদন পাঠকদের কেউ কেউ পড়ে বেশ মজাও পেয়েছেন। শেয়ার করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

করোনার শুরুতে বাংলাদেশে আমরা অনেক গুজব দেখেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তার দুই-একটি কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে খবর হিসেবেও উঠে এসেছে। আর পদ্মাসেতুতে 'শিশুদের মাথা ও রক্ত লাগবে' এই গুজবে গত বছরের জুন মাস থেকে পরবর্তী তিনমাসে বাংলাদেশে ছেলে ধরা আতঙ্কে অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।
কয়েক দশক আগে ১৯৮৭ সালে 'ঢোল কলমির' গুজব যখন ছড়ায় তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না। তখন মূলধারার সংবাদ মাধ্যমের হাত ধরেই এই গুজব ছড়িয়েছিলো। গুজবের ডালপালাও বেশ ছড়িয়েছিল। গুজব ছিলো ওই গাছের পাতা গায়ে লাগলে মানুষ মারা যায়। তার পরে বলা হলো, ওই গাছে যে পোকা বসে তা গায়ে লাগলে বা কামড় দিলে মানুষ মারা যায়। পরে দেখা গেল পুরোটাই গুজব।

কোনো একটি ঘটনা ঘটলে বাতাসে অনেক ধরনের কান কোনো একটি ঘটনা ঘটলে বাতাসে অনেক ধরনের কান-কথা থাকে। থাকে নানা ধরনের সত্য-অসত্য তথ্য। কখনো আবার সত্যের সাথে রঙ চড়িয়ে বাজারে অনেক তথ্য ছাড়া হয়। আর প্রতিবেদন যদি তার ভিত্তিতে হয় তাহলে সেটা গল্প হতে পারে সংবাদ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ''সংবাদে কখনো সত্য আর অসত্যের মিশ্রণ থাকতে পারেনা। সংবাদ শতভাগ তথ্যভিত্তিক। শত ভাগ সত্য।'' তাঁর মতে, ''নিউজ কখনো ফেক নিউজ হতে পারে না। ফেক তো ফেক। সেটা আবার নিউজ হয় কিভাবে!'' (ডয়েচেভেলে, ১৪.৮.২০২০)

প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে কখনো কখনো এই গল্প-গুজবের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে ঘটনাটি যদি আলোচিত হয়। যেমন হয়েছে মেজর সিনহা হত্যার ঘটনায়। কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম এমন ধরনের সংবাদ প্রকাশ করেছিল যাতে তারা হত্যা রহস্য উদঘাটন করে ফেলেছেন। জড়িতদের সবাইকে চিহ্নিতও করে ফেলেছেন। সিনহার সাথে থাকা সিফাত সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা না বললেও তার মুখ দিয়েই হত্যার বিবরণও প্রকাশ করেছিল আরেকটি পত্রিকা। তাতে কোনো সোর্স নেই। সিফাত কার সাথে কথা বলেছেন? তদন্তকারীদের সাথে না ওই প্রতিবেদকের সাথে তাও বলা হয়নি। যেন সংবাদ নয়, গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় কেউ পিছিয়ে থাকতে চান না।

সিনিয়র সাংবাদিক ও টিভি টুডে'র প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ''এখন আমরা দেখছি প্রভাবশালী গণমাধ্যমের দুর্বল সাংবাদিকতা। কোনো সাংবাদিক যা লেখেন তা তাকে প্রমাণ করতে হয়। প্রমাণ করতে না পারলে সাময়িক বাহবা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।'' (ডয়েচেভেলে, ১৪.৮.২০২০)

১৯৮৯ সালের এপ্রিলে সাংবাদিক কন্যা শারমিন রিমা হত্যা খুব আলোচিত হয়েছিলো। তখন এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে খাটের তলার সাংবাদিকতা নামে এক ধরনের সাংবাদিকতার নাম দেয়া হয়। সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তখন কোনো কোনো সাংবাদিক নানাসূত্রের বরাতে এমনভাবে ওই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতেন যেন যে খাটের ওপরে খুন হয়, ঘটনার সময় তিনি সেই খাটের তলায় ছিলেন।

যমুনা টেলিভিশনের অনুসন্ধানী সাংবাদিক মোহসীন উল হাকিম বলেন, ''এই প্রবণতা এখনো আছে। বিশেষ করে মেজর (অব.) সিনহা হত্যার ঘটনায় এটা আমরা প্রবলভাবে দেখছি। আমার মনে হচ্ছে পাঠক বা দর্শক পেতে এটা কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম করছে। এটার জন্য প্রতিবেদকের দায়তো আছেই। কিন্তু নিউজরুম বা এডিটোরিয়াল পলিসিও দায়ী।'' তাঁর মতে এই প্রবণতা সংবাদমাধ্যমের ব্যাপারে গ্রাহকের শেষ পর্যন্ত আস্থাহীনতা তৈরি করে। আর সেটার দায় সব সংবাদধ্যমের ওপর গিয়ে পড়ে। (ডয়েচেভেলে, ১৪.৮.২০২০)

তাহলে সাংবাদিকতায় এই গল্প-গুজবের দায় কার? সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি, সম্পাদনা, সম্পাদকীয় নীতি, সম্পাদনার সাথে যুক্তদের গুরুত্ব অনেক। প্রতিবেদকের দায় আছে। কিন্তু প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেই সেটা প্রকাশ হয়ে যায় না। সম্পাদনার টেবিল হয়ে যায়। তাই গল্প-গুজবের খবর যারা প্রকাশ হতে দেন দায় তাদেরও। আর এই গল্প-গুজবের পেছনে নানা পক্ষ সুবিধা নিতে পারে। এর ভেতরে রাজনীতি থাকতে পারে, নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

সত্য কখনো কম বেশি হয় না। কোনো কিছু রঙ লাগিয়ে, ফুলিয়ে বা অসত্য তথ্য প্রকাশ করা যেমন সাংবাদিকতা নয়। তেমনি সত্য গোপন করা বা প্রকাশ না করাও অপসাংবাদিকতা। এই দুইটি দিকেই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। নাহলে সমাজে যারা কুতথ্য প্রচার করে তারা এর থেকে সুবিধা নিতে পারে।

অনিশ্চিত পরিস্থিতি-উদ্বেগে, কুতথ্য ছোটে দ্রুতবেগে

পরিস্থিতি যদি হয় অনিশ্চিত, মনের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করে, সঠিক সত্য পাওয়া থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকে তখনই কুতথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমনটাই মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা। তবে কুতথ্যে কান দেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার ভূমিকা রয়েছে।

১৯৯১ সালে আফ্রো-অ্যামেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কুতথ্য ছড়িয়ে পড়ে। ট্রপিক্যাল ফ্যান্টাসি সোডা পপ নামে বাজারে একটা কোমল পানীয় বের হয়। এটি বাজারে আসার সাথে সাথে গুজব রটে যায় যে, এই পানীয় খেলে কৃষ্ণাঙ্গরা বন্ধ্যা হয়ে যাবে। এই গুজবের কারণে ওই পানীয়ের বিক্রি কমে যায় ৭০ ভাগ। এমনকি মানুষ ওই পানীয় সরবরাহকারীর ট্রাকের উপর হামলাও করেছিলো বেশ কয়েকবার।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী নিকোলাস ডিফনজো এবং প্রশান্ত বর্দিয়া গুজবের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে কুতথ্যের চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে।

এক. এটা মানুষের কোন মতামত নয়, বরং কোন তথ্য সংক্রান্ত বিবৃতি হতে পারে। উপরের ঘটনায় দেখুন কৃষ্ণাঙ্গরা বন্ধ্যা হবে - এটা এক ধরনের বিবৃতি।

দুই. প্রচারযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি প্রচার না করত ওই পানীয় খেলে বন্ধ্যাত্ব হয়, তাহলে সেটা গুজব হত না।

তিন. অনিশ্চিত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য, অর্থাৎ যা যাচাই-বাছাই করা সম্ভব নয়। যেমন, উপরের ঘটনাটি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কে প্রথম কাকে বলেছে কেউ জানে না।

চার. কুতথ্য এমন হবে, যেখানে মানুষ যা জানতে চাইছে তার উত্তর আছে। অর্থাৎ ইংরেজিতে যেটাকে বলে 'ইনস্ট্রুমেন্টালি রেলেভেন্ট'। এসব তথ্যকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভাববে। কেননা এসব তথ্য তার জীবনের সাথে জড়িত, অর্থাৎ এর প্রাসঙ্গিকতা আছে। যেমন, অনেক খাবার খেলে পুরুষের যৌনক্ষমতা কমে যায় বলে অনেকের বিশ্বাস।

কুতথ্যের প্রাথমিক কাজ হল এমন একটা বিষয় যে নিয়ে মানুষের পরিষ্কার ধারণা নেই কিন্তু আগ্রহ আছে। কুতথ্যে এ ধরনের তথ্যই বেছে নেয়া হয়, যেখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ রয়েছে। যেমন ধরুন, একসময় গুজব রটেছিলো 'গণেশ'-এর মূর্তি দুধ খাচ্ছে। এই কুতথ্যে কান দিয়ে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাদের মাটির তৈরি গণেশে দুধ ঢাললেন ও দেখলেন দুধ তার দেহে মিশে যাচ্ছে। অনেক গণমাধ্যমে কেবল এটাই প্রকাশ হলো যে, গণেশ দুধ খাচ্ছে এবং বিভিন্ন মন্দিরে মানুষের ঢল নেমেছে গণেশকে দুধ খাওয়াতে। পরে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জানালেন তখন প্রচণ্ড গরমের কারণে মাটি আসলে দুধ শুষে নিচ্ছিল। বিভ্রান্তি বা দ্বিধান্বিত মন আসলে কুতথ্য প্রবেশের উর্বর জায়গা।

তথ্য বা খবর সঠিক কিনা বুঝব কীভাবে

ভুয়া তথ্য ও খবর দ্রুত খুঁজে পাবার উপায় জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট 'ফুল ফ্যাক্ট'। ফেসবুকে কিছু শেয়ারের আগে নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

১৯৪৭ সালে 'দ্য সাইকোলজি অফ রিউমার' বইয়ে গর্ডন অলপোর্ট ও লিও পোস্টম্যান কুতথ্য ছড়ানোর মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁরা যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন-

এক. অনিশ্চিত পরিস্থিতি : পরিস্থিতি যখন অনিশ্চিত তখন মানুষ গুজব ছড়ায় বা গুজব ছড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের কথা। তিনি যখন শেষ দিনগুলোতে আমেরিকায় ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন, তখন প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেখা যেতো তিনি আর নেই, অথবা অবস্থা খারাপ, এই রাত নাও কাটতে পারে। তখন পরিবারের পক্ষ থেকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপডেট দেয়া শুরু করলো গণমাধ্যম। সেখানেও সমস্যা। পরিবারের এক একজন এক একরকম মন্তব্যকরায় জনগণ আরও বিভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কুতথ্যকেই আঁকড়ে ধরে। কারণ, ভাবে হয়ত মানুষটি চলে গেছে কিন্তু পরিবার জানতে দিচ্ছে না।

দুই. উদ্বেগ : মানুষ যখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকে, তখন গুজব ছড়ায় বা গুজবকে গ্রহণ করে। উদ্বেগের সাথে অনিশ্চয়তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব মানুষের মধ্যে বেশি উদ্বেগ কাজ করে তারাই বেশি গুজব ছড়ায়। গবেষণায় এটাও দেখা গেছে যে, খারাপ কোন ঘটনার গুজব ভালো কোন ঘটনার গুজবের চেয়ে দ্রুত ছড়ায়।

তিন. তথ্যের গুরুত্ব : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অর্থাৎ রটনাকারী যখন জানে যে, এই বিষয়ে তথ্যগুলো মানুষ জানতে চায় অর্থাৎ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তখনই তা ছড়ায়। আর যারা গুজব ছড়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সেটা বিশ্বাস করে বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা।

চার. অস্পষ্টতা : কোন বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে মানুষ গুজবে কান দেয়।

পাঁচ. নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা : মানুষ তাদের ভাবমূর্তির সাথে যায় এমন তথ্যে বিশ্বাস করে ও সেই গুজবকে সত্য বলে ধরে নেয়। যেমন, একজন ধার্মিক মুসলমান

ফেসবুকে শেয়ার করলেন গরুর মাংসে আল্লাহ্ আকবর লেখা আছে আরবিতে। ৫/৬ বছর আগে ফেসবুকে এটা ঘুরে ঘুরে অনেকেই শেয়ার করেছেন। কারণ তাদের ধার্মিক মনোভাব বোঝাতে এই গুজবটি সাহায্য করছে।

ছয়. ভালো লাগা : অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ নিজেদের ব্যাপারে ভালো অনুভব করতে চায় এবং সেই জায়গা থেকে গুজব রটায়। এক বন্ধুর কথা বলি যে অন্যদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য রটিয়েছিল যে তার ক্যান্সার হয়েছে। সবাই খুব দুঃখ পেয়ে সবসময় ওর খোঁজ খবর নেয়া শুরু করলো। হঠাৎ একদিন ওর ভাইয়ের সাথে কথায় কথায় জানা গেলো ওর অন্য শারীরিক সমস্যার কারণে কিছুদিন হাসপাতালে ছিলো এবং সে পুরোপুরি সুস্থ। তার কখনোই ক্যান্সার হয়নি।

সাত. প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে : গবেষকেরা বলছেন অন্যকে নিচু করতেও গুজব রটানো হয়, বিশেষ করে তা যদি হয় কোন গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তির প্রতিপক্ষ। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এগুলোকে বলে 'ওয়েজ রিউমারস'। অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের সাথে নিজেদের পার্থক্য বোঝাতে যেসব গুজব রটানো হয়।

আট. দৃঢ় সামাজিক অবস্থান : সামাজিক অবস্থানকে শক্ত করতেও অনেকে গুজবের আশ্রয় নেয় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এর মাধ্যমে গুজব রটনাকারীরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চান।

তবে এক একটা গুজব সমাজের এক এক শ্রেণির মানুষ এক এক ভাবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ মানসিকতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। কোন মানুষ গুজব ছড়াচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক অবস্থানের উপর বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, কিছু কিছু গুজব নির্দিষ্ট কিছু দলের মানুষের মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। কারণ, তারা হয়ত কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, ধর্ম, মতাদর্শে বিশ্বাস করে এবং ওই সংক্রান্ত যেকোন গুজবকে বিশ্বাস করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, একটি নির্দিষ্ট গুজব তখনই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যখন মানুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তা মিলে যায়। এ কারণে একই গুজব গ্রামাঞ্চলে যতটা দ্রুত ছড়াবে শহরে হয়ত ততটা ছড়াবে না।

শেষ করবো 'গোয়েবেলসীয় মিথ্যা' দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসি সরকারের তথ্যমন্ত্রী ছিলেন জোসেফ গোয়েবেলস। তার গুজব রটানোর

ক্ষমতার কারণে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। তার বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, 'একই মিথ্যা বার বার বললে তা সত্যে রূপান্তরিত হয়।' ইহুদিদের বিরুদ্ধে এমন সব মিথ্যা তিনি সুন্দরভাবে প্রচারে সমর্থ হয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তার মিথ্যা শুনে নাৎসি বিরোধীরাও ইহুদিবিরোধী হয়ে উঠেছিল। কারণ গোয়েবেলস যেসব তথ্য ছড়িয়েছিলেন তা শুনতে শুনতে নিরপেক্ষ জার্মানরাও এটা ধরে নিয়েছিল যে, দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হতে হলে ইহুদিবিরোধী হতে হবে।

গোয়েবেলসের গুজব নিয়ে প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষের কয়েকটি লাইন :
যা ঘটে তা ঘটেই কি? কীভাবে তা বোঝাবো নিজেকে?
আমরা যা দেখি শুনি কিছুমাত্র মানে নেই তার
যতক্ষণ তুমি এসে ভাষায় না রূপ দাও তাকে
ইতিউতি তারা সব জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে থাকে
.....
বিকারহীন আমি সহজেই মেনে নিই সব
ঘটে যা তা সত্য নয়, সেই সত্য যা রচিবে তুমি।

কুতথ্যের শিকার হিজড়া সম্প্রদায়

হিজড়াদের লিঙ্গপরিচয় বিষয়ে সমাজের ভাবনা আলোচনা হয় না। সম্প্রতি সরকার তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। তবু এখনো তারা নারী, পুরুষ নাকি অন্যকিছু ভাবনাটা সমাজে আছে। পরিবার ও সমাজে এ নিয়ে কোন কথা হয় না। বরং তাৎপর্যপূর্ণ যে, এবিষয়ে নানা জিজ্ঞাসা ও বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। হিজড়া বা ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীও মানুষ। পরিবার ও সমাজ থেকে বিতাড়িত ও নির্যাতিত মানুষ। বর্তমানে তারা কোনপ্রকারে অন্য জগতের মানুষ হয়ে বেঁচে আছে। তাই এ বিষয়ে সকলের স্বচ্ছ ধারণা ও তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা থাকা প্রয়োজন।

তাদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা বিভিন্ন লেখা মাঝেমধ্যে পত্রিকায় দেখা যায়। সমাজের সর্বত্র হেয় হওয়া, যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া, আইডেনটিটি বা পরিচয় অর্থাৎ নারী, নাকি পুরুষ বুঝতে না পারা এবং এ কারণে প্রচলিত ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা না পাওয়া ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় ও সাধারণ সমস্যা হলো পরিচয় সংকট। কেন এমনটা হয়? এক্ষেত্রে কুতথ্যের কি কোনো ভূমিকা আছে? এগুলো কি দুর করা সম্ভব? দূর না হলে হিজড়াদের নিয়ে সমস্যা সমাজে থেকে যাবে।

কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে একটি খবর ছিল, চাকরি দেওয়ার মানসে কয়েকজন হিজড়ার ডাক্তারি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল তাঁরা পুরুষ। অতএব, চাকরি হয়নি। লক্ষণীয়, দাপ্তরিক কাগজপত্রে হিজড়া জনগোষ্ঠীর কারও নাম পুরুষের, কিন্তু তিনি সে নামে পরিচিত হতে চান না, চান নারীর নামে পরিচিত হতে। আর কারও নাম নারীর, তিনি পরিচিত হতে চান পুরুষের নামে। তাই হিজড়াদের স্বকীয় সত্তা বা আইডেনটিটি যথাযথভাবে বোঝার জন্য যৌনাঙ্গ নয়, সার্বিকভাবে মানুষের যৌনতা বা সেক্সুয়ালিটি বিষয়টি আলোচিত ও বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

যৌনাঙ্গ' ও 'যৌনতা' দুটি ভিন্ন বিষয়; যেমন 'সেক্স' ও 'জেন্ডার' দুটি আলাদা। আলাদা হলেও ব্যক্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে দুটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির যৌনসত্তা বা সেক্সুয়াল আইডেনটিটির নিয়ামক হচ্ছে তার ভেতরগত উপলব্ধিভিত্তিক ইচ্ছা। এটার স্বীকৃতি প্রয়োজন বলেই হিজড়াদের অনেকেই তাঁদের বর্তমান নাম-পরিচয় পরিবর্তন করতে চান। যে নাম তাঁরা পরিবর্তন করতে চান, সেটি জন্মের সময় দৃশ্যত জৈবিক লিঙ্গের ভিত্তিতে পরিবারের দেওয়া। আকাঙ্ক্ষিত নামটি হচ্ছে তাঁর বয়সের একটা পর্যায়ে স্বকীয় সত্তার উপলব্ধিজাত।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর সবাই শারীরিকভাবে পুরুষ ও মানসিকভাবে নারী এ কথা ঢালাওভাবে বলা যায় না। 'হিজড়া' শব্দটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণা হিসেবে অতীতকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ যেমন রয়েছেন, তেমনই আছেন অলিঙ্গ, নপুংসক, দ্বৈতলিঙ্গ, আন্তঃলিঙ্গের মানুষেরা। দেখা যায়, হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগতভাবে যারা পুরুষ, তাঁদের উপস্থিতি জন্মগতভাবে নারীর তুলনায় বেশি। এর পেছনে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে।

পরিবার ও সমাজে ছেলেদের লম্বা চুল, শাড়ি পরা, লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার যতটা না গ্রহণীয়, তার চেয়ে মেয়েদের ছোট চুল ও প্যান্ট-শার্ট পরা বেশি গ্রহণীয়। অথচ গ্রহণীয় নয় বলে হিজড়ারা নিজ মাতৃ-পিতৃপরিবারে স্থান পায় না। তাই বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের নিরাপত্তা ও জীবিকার তাগিদে গুরু ধরে। এরা দৃশ্যমান, দলে চলে ও রাস্তাঘাটে টাকা তোলে আর নানারকম সহিংসতার শিকার হয়। আরেকটি গ্রুপের বেশিরভাগই পরিবার ও সমাজে মিশে যান। তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে নানা রকম গল্প ছড়ায়।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর যাঁরা জন্ম থেকে শারীরিকভাবে পুরুষ কিংবা নারী, তাঁরা মন-মানসিকতায় নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে মনে করেন এবং তাঁদের আচরণে সে রকম প্রকাশ ঘটে। যেমন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও পুরুষ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মানো সত্ত্বেও নিজেকে নারী ভাবেন, সে ধরনের পোশাক পরে সাজসজ্জা করেন। আবার একইভাবে উল্টোটা ঘটে অর্থাৎ জৈবিকভাবে (বায়োলজিকালি) নারী কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষসুলভ। জন্মগতভাবে এই নারী-পুরুষদের ভেতরগত যৌনসত্তা ও আচরণ বা চর্চা পূর্বোল্লিখিত যেকোনো ধরনের যৌনতা/সেক্সুয়ালিটি হতে পারে

যৌনতা প্রতিটি জীবনের জন্য একটি মৌলিক বিষয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে পরিবার ও সমাজের সুস্থতা। বিষয়টি আড়ালে না রেখে এ নিয়ে যত বেশি খোলামেলা কথা বলা ও লেখালেখি করা যাবে, ততই সমাজে ইতিবাচক চিন্তা ও চর্চার পথ প্রশস্ত হবে। পরিবার তথা মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে মিডিয়া শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া শিক্ষাক্রমে শরীর, বয়োসন্ধি, যৌনতা, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য, সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে জাতিকে সভ্যতা, সমতা এবং মানবিকতাচর্চায় এগিয়ে নেওয়ার।

ভুল ধারণার শুরু হয় পরিবার থেকেই

"আমার পরিবার মনে করতো আমাকে জ্বীন-ভূতে ধরেছে এই কারণে আমি মেয়েদের মত আচরণ করছি। তারা কবিরাজি চিকিৎসা করিয়েছে, শারীরিক নির্যাতন করেছে"। কথাগুলো বলছিলেন ঢাকার ধামরাইয়ের শাম্মী। তিনি এখন একজন রূপান্তরিত নারী। জন্মগতভাবে লিঙ্গপরিচয় পুরুষের হলেও বয়ঃসন্ধিকালে তিনি বুঝতে পারেন তিনি তার পুরুষসহপাঠী বা খেলার সাথীদের থেকে আলাদা। শাম্মী বলছেন, তিনি ছোটবেলা থেকে মেয়েদের মতো সাজগোজ ও ঘর গৃহস্থালির কাজ করতেন, মেয়েদের সঙ্গ তার প্রিয় ছিল। ফলে বাবা-মায়ের বকা, মারপিট এমনকি তাবিজ-কবজ দিয়ে চিকিৎসাও করা হয়েছে। পরিবারের কাছে শাম্মী ছিলেন অসুস্থ। "আমি যাতে বাড়ি থেকে বের না হই, কারো সাথে কথা না বলি তারা সে ব্যবস্থা করেছিল। কারণ আমি মানুষের সঙ্গে কথা বললেই তারা বলছে আমি হিজড়া। প্রতিনিয়ত আমার বাবা-মা, ভাই-বোন আমার দোষ ধরা শুরু করলো"।

"ঐ সময় আমি নিজে জানি না যে আমি কে, আমি কেন, এই মুহূর্তে আমার কি করা উচিৎ, আমি কোথায় কার কাছে যাবো, আমার কি এই পৃথিবীতে কেউ নেই, আমি কি একাই এইরকম, আমার মত কি আর কেউ নেই? এসব প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খেতো। একসময় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম," বলেন শাম্মী। জানিয়েছেন, লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য সপ্তম শ্রেণিতেই শেষ হয় তার পড়াশোনা। এ সময়ে পরিচয় হয় তারই মতো এক হিজড়ার সঙ্গে। তিনি হিজড়াদের ডেরায় শাম্মীকে নিয়ে যান। বলছেন, তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে তার পরিবার হাফ ছেড়ে বেঁচে যায়। এখনো তার পরিবার তাকে মেনে নেননি।

রাজবাড়ীর তানিশা ইয়াসমিন চৈতি পুরুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে এখন একজন রূপান্তরিত নারী। চৈতি বলেন, "যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন মাকে বলে দেই, আমি তোমার পুত্র সন্তান না, আমি মেয়ে হতে চাই। মা সাতদিন-সাতরাত শুধু কেঁদেছে। এরপর আমার পরিবার-আত্মীয়-স্বজন সবাই বলা শুরু করলো, আমি ঢং করে হিজড়া সাজছি"। "এটা আমাকে মানসিক পীড়া দেয়, মানুষ কি ইচ্ছা করে এমন হতে পারে? পরিবার আমাকে ডাক্তারের কাছ নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে এত মানসিক-শারীরিক অত্যাচার বেড়ে যায় যে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই"। পরিবারের সদস্যরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না, যে সন্তান পুরুষ বা নারীর লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্ম নিয়েছে সে বিপরীত লিঙ্গের একজনের মত আচরণ করবে।

পরিবারে কেন মেনে নেয় না? উত্তর জানতে কথা বলেছিলাম এমন একজনের সঙ্গে যার ছেলে সন্তান এখন রূপান্তরিত নারী। তিনি পরিচয় গোপন করে বলেছেন, "আমার যে ছেলে ছিল সে তো এখন হিজড়া হয়ে গেছে। তাকে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, আলাদা ঘর দিয়েছি কিন্তু সে থাকেনি। আমার আরো সন্তান আছে,

পরিবারে আরো মানুষ আছে। সবার কথা চিন্তা করে আমি তাকে মানতে পারিনি"। "বলেছি যদি ভালো হয়ে যাও অর্থাৎ পুরুষ হয়ে যাও তাহলে ফিরে আসবে। আশপাশের লোকজনকে বলেছি সে বিদেশে থাকে"। তিনি মনে করেন তার একটা সন্তান মারা গেছে। তিনি জানেন তার রূপান্তরিত কন্যা কোথায় আছে, কী করছে কিন্তু তাকে তিনি মেনে নিতে চান না।

পরিবারের সদস্যদের না মানার পেছনে সমাজের একটা চাপ তৈরি হয়। সেই চাপ অনেকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। হিজড়াদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীরা বলেছেন, যেসব অভিযোগ তারা পান, তার বড় অংশই হিজড়াদের বাবা-মার সম্পত্তির ভাগ না পাওয়ার বিষয়ে।

নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি বলছিলেন যখন তার ভাই মেয়েদের মতো আচরণ করা শুরু করে তখন তাদের পরিবারকে গ্রামের মধ্যে একঘরে করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইসলাম বলেন, "আমাকে, আমার বাবাকে গ্রামের লোকজন বলতো তোমার ছেলেতো হিজড়া, সেতো নোংরা, কেন তাকে বাড়িতে রাখো? স্কুল থেকে শিক্ষকরা বাবাকে বলতো আমার ভাইয়ের জন্য অন্যদের পড়াশুনা হবে না, তারা খারাপ হয়ে যাবে"। আমার মা খুব কষ্ট পেয়েছে। ১৭/১৮ বছর বয়সে যখন আমার ভাই বাড়ি থেকে চলে যায় আমরা কেউ তাকে ঠেকাইনি। আজ পর্যন্ত সে গ্রামে ঢুকতে পারে না। মা যখন মারা যান তখন সে চুল কেটে ছেলের পোষাক পরে একটুক্ষণের জন্য দেখতে এসেছে। আমাদের কিছুই করার ছিল না", বলেন তিনি। (৪ ডিসেম্বর ২০২১, বিবিসি বাংলা)

মানসিক না শারীরিক পরিবর্তন

তৃতীয় লিঙ্গ বলতে বাংলাদেশে সাধারণত যেসব পুরুষ নিজেদের নারী মনে করে বা রূপান্তরিত নারীদের বোঝানো হয়, আবার অনেক নারী যারা নিজেদের পুরুষ মনে করে। এক লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্ম নিয়ে আরেক পরিচয়ে রূপান্তরের যে বাসনা সেটা কি মানসিক না শারীরিক?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক তাসলিমা ইয়াসমিন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, এটা মানসিক ও শারীরিক উভয় কারণে হতে পারে। তাসলিমা ইয়াসমিন বলেন, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা কমন ফিচার সেটা হচ্ছে তারা বায়োলজিক্যালি পুরুষ কিন্তু তারা নিজেদের নারী মনে করেন। সুতরাং একজন নারীকে তিনি যেভাবে দেখেন সমাজে, তিনি নিজেকে সেভাবেই উপস্থাপন করেন। তাদের মন-মানসিকতায় তারা একেবারেই একজন

নারী। পুরুষদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম"। "এটা ছাড়াও আরো জেন্ডার আইডেনটিটির মানুষ আছে যারা নিজেদের পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই মনে করেন না। এরকমও ব্যক্তি আছেন যাদের আমরা ইন্টার-সেক্স বলছি। যাদের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যালি যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে অ্যানোমালি দেখা দেয়। যার কারণে তারা তাদের যে বায়োলজিক্যাল আইডেনটিটি, তাদের যে ফিজিক্যাল যে প্রকাশভঙ্গী সেখানে নারী এবং পুরুষের যৌনাঙ্গের একটা মিশ্রণ থাকে", বলেন তিনি।

কী ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়

১৩/১৪ বছর বয়সে যখন একটা শিশু বাড়ী থেকে বের হয়ে একেবারে অচেনা একটা পরিবেশে যায় তখন তাকে নানা ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার নিয়ে কাজ করে 'সম্পর্কের নয়া সেতু'র সভাপতি জয়া শিকদার বলেন প্রথমেই ঐ শিশুটি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। তিনি বলেন, "এমন একটা ছেলে যার আচরণ মেয়েসুলভ, তার অভিভাবক নেই, সে প্রথম ধাপেই যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। একটা বড় সময় তাকে এই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এরপর সে কাজের খোঁজ করতে থাকে। এভাবেই হিজড়া কমিউনিটির সঙ্গে পরিচয় হয়। সেখানে তাকে প্রমাণ করতে হয় যে সে হিজড়া"। "এরপর গুরু মা তার ডেরায় আশ্রয় দেয়। সেখানেও জীবন সহজ না। অনেক নিয়ম-কানুন মেনে তাকে চলতে হয়। কিন্তু এই ছেলে বা মেয়েকে যদি প্রথমেই তার পরিবার মেনে নিত তাহলে তাকে বাকী জীবন এত বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে হত না"।

কারা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ

বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কারা সেটা নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। সাধারণত কোন ছেলে যখন মেয়েদের আচরণ করে বা মেয়েতে রূপান্তরিত হয় তাকে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু যারা তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন

তারা বলছেন জন্মগতভাবে পুরুষলিঙ্গ বা নারী লিঙ্গ অথবা এই দুইটার কোনটাই নাও হতে পারেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক তাসলিমা ইয়াসমিন বলেন সরকারের কাছ থেকে ২০১৮ সালে একটা গেজেট নোটিফিকেশন এসেছিল যেখানে তাদের 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে পরিচয় করার জন্য বলা হয়েছিল। নানা দাপ্তরিক কাজে নারী, পুরুষের সঙ্গে কখনো অন্যান্য, কখনো হিজড়া লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তবে পরিষ্কার করে কোথাও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে সেটা বাংলাদেশে বলা নেই, বলছিলেন তাসলিমা ইয়াসমিন।

"এমন না যে আইন করে তৃতীয় লিঙ্গ বলা হয়েছে। এক লাইনে ছোট করে গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে তাদের 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে পরিচয় করাতে। সেখানে তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। এই বিষয়টা আরো বিভ্রান্তি তৈরি করছে"। "হিজড়া যারা আছেন তারা একটা কালচারাল কমিউনিটি (সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়)। সকল ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হিজড়া বলে পরিচয় দেন না বা তারা এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। হিজড়া কোন জেন্ডার আইডেনটিটি নয়। কাজেই তৃতীয় লিঙ্গ বলেন আর জেন্ডার ডাইভার্স কমিউনিটি আমরা যাদের বলি তাদের পরিচয়টা কিন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, ফলে পলিসি লেভেলে তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বাইরে থেকে যাচ্ছে"।

তৃতীয় লিঙ্গ, হিজড়া লিঙ্গ বা হিজড়া তাদের পরিচয় যেটাই হোক না কেন তারা আজো সমাজের বাইরে। এদের অধিকার নিয়ে নানা সংগঠন কাজ করলেও, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। কিন্তু সবার আগে যদি তাদের পরিবার থেকে পূর্ণ সমর্থন দেয়া হয়. তাহলে তাদের জীবনে চলার পথ হবে আরো সহজ, মসৃণ।

হিজড়া হওয়া কোন ব্যাধি না - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, হিজড়াদের বিষয়টি এখন থেকে আর 'মানসিক বা আচরণগত ব্যাধি' হিসেবে দেখা হবে না। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাটি এই লিঙ্গগত ইস্যুগুলোকে 'যৌন স্বাস্থ্য' বিষয়ক চ্যাপ্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা এখন বোঝা যাচ্ছে হিজড়া "আসলেই কোন মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক না"।

আইসিডি-১১ নামে পরিচিত সবশেষ ম্যানুয়াল গ্রন্থটিতে লিঙ্গের অসামঞ্জস্যতাকে কোন ব্যক্তির লৈঙ্গিক অভিজ্ঞতা এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের অসামঞ্জস্যতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগের ভার্সন আইসিডি-১০ এ মানসিক ও আচরণগত ব্যাধি নামক চ্যাপ্টারে ট্রান্সজেন্ডারকে লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

ডব্লিউএইচও'র একজন প্রজনন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. লালে সে বলছেন, "এটা মানসিক স্বাস্থ্যব্যাধির আওতা থেকে তুলে নেয়া হয়েছে কারণ আমাদের একটা ভালো বোঝার জায়গা তৈরি হয়েছে যে সেটা (হিজড়া) আসলে কোন মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা না। এটা এভাবেই রেখে দেওয়ায় আগে স্টিগমা তৈরি হচ্ছিল।"

"তাই এই স্টিগমা দূর করার জন্য এবং একই সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য এটা ভিন্ন একটা চ্যাপ্টারে স্থান দেয়া হয়েছে," যোগ করেন তিনি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এলজিবিটি অধিকার বিষয়ক পরিচালক গ্রেইমি রেইদ বলেছেন, "এই সংশোধনীর আলোকে সরকারগুলোর উচিত খুব দ্রুত জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় আইন সংস্কার করা।"

সাক্ষাৎকার

'মানুষ যখন আসল খবরটি পায় না, গুজব তখনই তৈরি হয়'
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এমিরিটাস অধ্যাপক। সমাজ রূপান্তরকামী লেখক-শিক্ষাবিদ। গুজব ও তার ফলাফল বিষয়ে তার একটি সাক্ষাতকার ১৪.৮.২০২০ তারিখে জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচেভেলে গ্রহণ করেছিল। এটি প্রয়োজনীয় মনে করে পুনমুদ্রণ করা হলো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেনে না জেনে বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করেন অনেকে। এতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : এই মাধ্যমে মানুষ সেগুলোই শেয়ার করে যেগুলো সে বিশ্বাস করতে চায়। যে জিনিসগুলো তার পছন্দ হয় সেগুলোই সে নিয়ে নেয়। এভাবেই ছড়ায় এগুলো একটা গোপনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রকাশ্য হয় না, কিন্তু এর প্রভাব পড়ে।

আমরা দেখেছি, অনেকে ভুল তথ্য শেয়ার করার পরও সেটা অনেকে তা প্রত্যাহার করেন না...

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ভুল তথ্য মানুষ দুই কারণে দেয়। এক. ইচ্ছে করে দেয় অর্থাৎ, বানিয়ে দেয় রংচং মিশিয়ে। আরেকটা কারণ হলো, যে দিচ্ছে সে হয়তো নিজে তৈরি করেনি, শুনেছে। কিন্তু ওইটা তার পছন্দ হয়েছে। আর প্রত্যাহার করা না করা সমান। কারণ, এটা ছড়িয়ে পড়লে যারা বিশ্বাস করার তারা করে ফেলবে। এই কারণে প্রত্যাহার করার কোনো তাৎপর্য নেই। কারণ, এটা তো গুজবের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো তো তথ্য নয়, গুজব।

অনেকের মৃত্যুর সংবাদ না জেনে ফেসবুকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ তিনি মারা যাননি। ওই পরিবারটিতো চরম বেকায়দায় পড়ে, তাই না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অবশ্যই। এটাতো খুবই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। এটাতো শুধু পরিবার নয়, তার অনুরাগীদের উপরও প্রভাব পড়ে। এটা একটা মিথ্যাচার। কেউ যদি ইচ্ছে করে দেয় তাহলে সে অন্যায় কাজ করে। তাছাড়া অন্যের কাছ থেকে শুনে, যাচাই না করে দিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত না। আমি মনে করি এটা খুবই অন্যায় কাজ।

সরাজুল ইসলাম চৌধুরী : এদের খুব খারাপভাবে দেখবো। এটাতো প্রতারণার শামিল। একটা খবর সে বানালো বা যাচাই না করেই বলে দিলো এবং মুখরোচক হওয়ার কারণে অনেকেই শুনলো। এতে সে বড় হয়ে গেল। এই ধরনের প্রতারণা ঠিক না। এই ধরনের প্রতারণা পরিহার করা দরকার। এই ধরনের প্রতারণা চলে কেন সেটাও আমাদের দেখতে হবে। মানুষ যখন আসল খবরটি পায় না, গুজব তখনই তৈরি হয়।

সমাজে এসব খবরের কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : এটা তো সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এই ধরনের প্রতারণামূলক খবর দিয়ে এক ধরনের খ্যাতি অর্জন করা, ফলোয়ার তৈরি করার প্রভাব তো খারাপই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কতটা খারাপ আমরা হয়তো তার পরিমাপ করতে পারবো না।

যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তারা তো আইনগত ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : এটা একটা বড় সমস্যা। যারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তারা ব্যবস্থা নিতে পারে না। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটা আছে, সেটা কিন্তু এ থেকে রক্ষা করে না। শুধুমাত্র যারা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ছোট হোক আর বড় হোক, তারা একটা মামলা ঠুকে দিলে তাকে ধরে নিয়ে আসছে। এই আইনটার সুবিধা ব্যক্তিরা পাচ্ছেন না। এই ধরনের সুযোগ থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এগুলো আবার যাচাই করে দেখতে হবে। কারণ, এটাও একটা মিথ্যাচার হতে পারে। ফলে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আরেকটা মিথ্যাচার দিয়ে তো আর কাজ হবে না। কাজেই এগুলো যাচাই-বাছাই করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কি যা ইচ্ছে তা-ই করা সম্ভব?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো যা ইচ্ছে তাই করা যাচ্ছে। কিন্তু এটা যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের একটা মনিটরিং থাকা দরকার। যেটা মিথ্যা সেটা যেন তারা দেখে। যারা এটার দায়িত্বে আছে বা যারা এটা চালাচ্ছেন, তাদের উপরই দায়িত্বটা বর্তায়। সরকারের ভূমিকাও থাকবে। সরকার ওই কোম্পানিকে বলবে। গর্ভনমেন্ট তো কোনো অলৌকিক বিষয় না, গর্ভনমেন্টও ব্যক্তি। যেসব প্রতিষ্ঠান এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরই এটা দেখা উচিত। সরাসরি সরকারের হস্তক্ষেপটা আমার পছন্দ না। তখন এটার অপব্যবহার হতে পারে।

শুধু সামাজিক মাধ্যম না, পত্রিকা বা অনলাইনেও তো অনেক 'গল্প' ছাপা হচ্ছে। মানুষ এগুলো অনেক সময় বিশ্বাসও করছেন..,

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : মানুষের কোনো অপরাধ আমি দেখি না। যারা করছে, তারা হয়তো ইচ্ছে করেই করছে। মানুষ তো আসল খবর পাচ্ছে না। অবাধ তথ্য প্রবাহের কথা বলা হয়, কিন্তু আসলে তো তথ্য প্রবাহ নেই। খবর তো নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে যে সমস্ত খবর মানুষ জানতে চায়, সেই বিষয়ে তারা খবর পায় না। রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক অনাচারের খবর মানুষ জানতে চায়। কিন্তু সেগুলো পায় না। তখন গুজব ছড়ালে মানুষ খুশি হয়। তখন মনে করে একটা কিছু হচ্ছে। তখন মানুষ অন্যায্য আনন্দ পায়।

এই ধরনের ভুল খবর যারা ছড়াচ্ছে, তাদের কিভাবে নিবৃত্ত করা যায়?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ওই যে, যে মাধ্যম এটা প্রচার করছে আমি সেই মাধ্যমের উপরই দায়িত্ব দিতে চাই। তথ্য প্রবাহকে অবাধ করা দরকার। সত্যি তথ্য যাতে প্রচার পায়, সেই স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খুবই জরুরি। যে গুজবগুলো ছড়ানো হয় তার মধ্যে মতও থাকে। এটা যে একটা নিরপেক্ষ জিনিস, তা নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতাটা খুবই জরুরি।

সংবাদমাধ্যমে কি তাহলে সঠিকভাবে মত প্রকাশ হচ্ছে না?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : না, হচ্ছে না। সংবাদপত্র তো নানান রকমের প্রভাবের মধ্যে আছে। যারা বিজ্ঞাপন দেয় তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মালিকের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অবস্থান তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার অপছন্দ করবে কিনা এ বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকতে হয়। সংবাদপত্রে স্বাধীনতার অভাব তো অনেক দিনের পুরনো, এখনো সেটা আছে।

সামাজিক বা অনলাইন মাধ্যম আরো পরিশীলিতভাবে কিভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আমি যেহেতু প্রাচীনপন্থি লোক তাই সংবাদপত্র ও টেলিভিশনকে গুরুত্ব দিতে চাই। সংবাদপত্রে একটা খবর দিলে দায়িত্ব নিয়ে দেয়। টেলিভিশনে একটা খবর গেলে তারাও দায়িত্ব নিয়ে দেয়। সামাজিক মাধ্যম বা অনলাইনে যারা দিচ্ছে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই। যা ইচ্ছে তাই দিয়ে দিচ্ছে। আমি মনে করি, যেগুলো প্রচলিত গণমাধ্যম, যাদের দায় থাকে, তাদের আরো শক্তিশালী করা দরকার। সঠিক খবর দিতে পারার সুযোগ দেওয়া দরকার। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না দিলে তো গুজব তৈরি হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যত কমবে, গুজব তত বাড়বে, এটাই নিয়ম।

‘গুজবে বিশ্বাস করার কারণ হচ্ছে মানুষের বাকস্বাধীনতা হরণ করা’

ড. শাহদীন মালিক
আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাদেশে কুতথ্য একটা বড় ইস্যু। কুমিল্লায় ১৩ অক্টোবর ২০২১ এক অভিযোগ ছড়ানোর পর তৈরি হয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির। গুজব, কুতথ্য ছড়িয়ে এরপর চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও সবশেষে রংপুরে সাম্প্রদায়িক হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে শিশু ধর্ষণ এবং তারপর মৃত্যুর গুজব ছড়ানো হয়েছে, যা উসকে দিয়েছে পরিস্থিতিকে। বিভিন্ন সময়ে গুজব ও কুতথ্যের কারণে দেশে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় কেন হাতিয়ার হচ্ছে কুতথ্য? এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. শাহদীন মালিকের সঙ্গে।

দেশে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলা আগেও হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। মন্দির-মণ্ডপ, বাড়িঘরে ভাঙচুর-আগুন দেওয়া হচ্ছে, যা মূলত গুজবের রেশ ধরে। নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করছেন?

ড. শাহদীন মালিক : ধর্মের নামে যা হচ্ছে, তা অধর্মের কাজ বলে বিশ্বাস করি। তবে আদৌ ধর্মবাদীরা এসব করছে কি না তার নির্দিষ্ট সূত্র নেই আমার কাছে। যদি মুসলমানরা এসব সহিংসতা ছড়ায়, তাহলে তারা মূলত ইসলামকে জানেন না। ইসলামের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের ঘটনা ইসলামের পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিকেও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে, প্রশ্নবিদ্ধ করছে। নিরীহ মানুষকে হত্যা বা মানুষের বাড়িঘরে

আগুন দেওয়ার কথা কোনো ধর্মই বিশ্বাস করে না। অথচ গুজবের ওপর ভর করে মানুষ বিবেকহারা হয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে।

হামলার পর হামলার ঘটনা ঘটছে। রাষ্ট্র ও পুলিশ তা ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে...

ড. শাহদীন মালিক : এখনকার প্রশাসন-পুলিশ অদক্ষ-অযোগ্য বলেই মনে করি। একটি দৈনিকে দেখলাম, কুমিল্লার ঘটনায় ২৮টি মামলায় নয় হাজারের বেশি মানুষকে আসামি করা হয়েছে এবং এখন এমন মামলা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি মামলায় যদি ৫০০ মানুষকে আসামি করা হয়, তাহলে সেই মামলার তদন্ত ও বিচার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শেষ হবে, তা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। কখনোই এসব মামলার তদন্ত শেষ হবে না। এমন হামলার সঙ্গে অবশ্যই শত শত মানুষ জড়িত থাকে। কিন্তু মূল হোতা থাকে গুটি কয়েকজন। শত শত মানুষের বিচার করা কোনো দেশের বিচার ব্যবস্থা বা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। তার মানে হাজার হাজার মানুষকে আসামি করা পুলিশের সম্পূর্ণ অদক্ষতা এবং অযোগ্যতা অথবা জেনে-বুঝে ঘটনাকে চাপা দেওয়া।

কিন্তু মানুষ যে বিবেকহারা হয়ে এমন তাণ্ডব চালাচ্ছে! গুজবে কান দিচ্ছে...

ড. শাহদীন মালিক : গুজবে বিশ্বাস করার বহুবিধ কারণ থাকে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ রোধ করা, তার বাকস্বাধীনতা হরণ করা। মানুষ তার মত প্রকাশ করতে পারছে না। গণমাধ্যম তার ভূমিকা রাখতে পারছে না।

আর এসব সহিংসতার কারণে প্রথমত ইসলামের ক্ষতি হচ্ছে, যা তারা বুঝতে পারছে না। দ্বিতীয়ত পুলিশের অদক্ষতার কারণে জনআস্থা আরও কমছে। বিশেষ করে হাজার হাজার মানুষকে আসামি করে মামলার তদন্ত কাজকে বাধাগ্রস্থ করা হচ্ছে। এসব মামলার মাধ্যমে সরকার আগেই ধারণা তৈরি করে দিচ্ছে যে, এসবের বিচার হবে না। তৃতীয়ত যখন কর্তৃত্ববাদী সরকারের কোনো কথাই আর সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না, তখন সত্য-মিথ্যার যাচাই না করে কানকথাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে সহিংসতায় অংশ নেয়।

সমাজ যাচ্ছে কোন দিকে? উত্তরণের উপায় কী?

ড. শাহদীন মালিক : উত্তরণের উপায় আমার আপাতত জানা নেই। তবে চলমান পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে এতটুকু শঙ্কাবোধ করতেই পারি যে, সহিংসতা আরও বাড়বে। যে কারণগুলোর পরিণতিতে সহিংসতার সমাধান আপাতত হচ্ছে না। আর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ এই সংকট নিরসন করতে পারবে, তা কেউ বিশ্বাস করে না। সুতরাং বিপদের কথাই বলতে হচ্ছে।

গুজব দিয়ে ডিজইনফরমেশনটা বোঝানো যাবে না।

শান্তনু মজুমদার
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শান্তনু মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি নানা ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য বিষয়ে কাজ করেছেন। বিশেষ করে প্রথাগত নাগরিক সমাজের সদস্যদের কুতথ্য নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জন্য একটি মডিউলও প্রস্তুত করেছেন।
সম্প্রতি আমরা তার মুখোমুখি হই।

ডিজইনফরমেশনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গুজব শব্দটা দীর্ঘসময় ধরে ব্যবহার হচ্ছে। আপনি সম্ভবত প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'কুতথ্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাংলায় আগে কখনও এই শব্দটির ব্যবহার চোখে পড়েনি। আপনার কেন মনে হলো কুতথ্য শব্দটির ব্যবহার জরুরি?

শান্তনু মজুমদার : খুব ভালো একটা প্রশ্ন। আমি যখন ইংরেজিতে ডিজইনফরমেশন নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম তখন এর বিভিন্ন সংজ্ঞায়ন পড়ছিলাম বারবার। ওই সময় মনে হলো, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুরো বিষয়টাকে গুজবের ফ্রেমে বেঁধে রাখা হচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, এটা সঠিক হচ্ছে না। তখন আমরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরি করতে গিয়ে ডিজইনফরমেশনের বাংলা করলাম কুতথ্য। এবং এই কথাটাও বলতে চাইলাম যে, রিউমার বা গুজব দিয়ে ডিজইনফরমেশনটা বোঝানো যাবে না। কুতথ্য গুজব ছাড়াও হতে পারে। সুতরাং আমরা যে বিষয় নিয়ে কাজ করছি, অনলাইন হোক বা অফলাইনে হোক-কুতথ্য কোনো ব্যক্তি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কারো বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে; তিনি বা

তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মিথ্যা বা বানোয়াট বা অর্ধসত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে যখন কোনো কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। কন্টেন্টটা হতে পারে কোনো লেখা, বক্তৃতা। হতে পারে কোনো অডিও বা ভিডিও। এবং এই কন্টেন্টটা হাজার হাজার লোকের কাছে পৌঁছাবে এবং এটা উগ্রবাদীদের মাধ্যমে মারাত্মক বা ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে। যখন আমরা কাজ করব আমরা যেনো শুধু গুজব না বলি।

তাহলে গুজব আসলে কী? কী ধরনের হতে পারে?

শান্তনু মজুমদার : গুজব হঠাৎ তৈরি হয় এবং হঠাৎ এই মিলিয়ে যায়। এটা কোনো ফিল্মস্টার-এর জীবন নিয়ে হতে পারে কিংবা আমাদের যে এবারের দুর্গাপূজাতে দেখলাম, হিন্দুদের একজন উপাস্যের পায়ের উপরে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ রাখা হয়েছে, যেটার তথ্য ও ভিডিও খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং দেশজুড়ে কী হয়েছে আমরা তা দেখেছি। এটাও হতে পারে কোনো ফিল্মস্টার-এর বিয়ে বা বিয়ে ভাঙ্গা নিয়ে গুজব। কিন্তু সেটা মিনিটের মাঝে ছড়ায় না। এ জন্য আমি বলছি আমাদের মূল শব্দটা হবে কুতথ্য। কুতথ্য দিয়ে পুরো সমস্যাটা বোঝাবো। রিউমার বা গুজব দিয়ে নয়।

কুতথ্যের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি সবাই। কিন্তু এতে লাভবান হচ্ছে কারা? কিভাবে হচ্ছে? কতটা বা কোন প্রক্রিয়াই লাভবান হচ্ছে?

শান্তনু মজুমদার : ব্যাপারটা এতটাও জটিল না বোঝার জন্য। কুতথ্য সব আমলেই ছিল। আমরা যারা নিজেদের 'আমরা' বলছি আবার অন্যদের 'ওরা'। অর্থাৎ এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে, এক জাতি আরেক জাতির বিরুদ্ধে, এক ধর্ম আরেক ধর্মের বিরুদ্ধে এমনকি একটা ধর্মের ভিতরেই আরেকটি শাখা কুতথ্য তৈরি করছে, ছড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেন আমরা বিষয়টাতে অতি পরিচিত। এর কারণ হচ্ছে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে কুতথ্যের বন্টন, উৎপাদন, ভোগ ইন্টারনেট পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় একেবারেই পৃথক। কারণ এটা মূহুর্তের মধ্যে তৈরি করা যায় এবং তা ছড়িয়েও দেয়া যায়। সুতরাং এটা ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে আমি যদি মনে করি, পর্তুগালের মানুষদের ব্যাপারে কুতথ্য ছড়াবো, সেটা সম্ভব। আমি সেটা মূহুর্তের মধ্যে ছড়াতে পারি। এবং ওই কুতথ্য ঠেকানো এতটা সহজও হবে না। এটা থেকে বোঝা যায়, কুতথ্যের ব্যাপ্তিটা সর্বগ্রাসী।

কুতথ্যের প্রধান শিকার কারা?

শান্তনু মজুমদার : ভারতীয় উপমহাদেশের কথা যদি বলি, এখানে দেখি যে কুতথ্যের প্রধান শিকার হচ্ছে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং নারীরা। আমার

কাছে এই তিনটা মূল বিষয় কুতথ্যের কাছে অনেকটা পাস্ট, প্রেজেন্ট এবং কন্টিনিউয়াস টেনসের মতো। পূর্বে শুরু হইয়া বর্তমানে চলিতেছে এবং মনে হচ্ছে এটা চলিতে থাকবে। কুতথ্য মূলত ইন্টারনেটে এসে; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে, এটা আর কোনো সীমা পরিসীমায় আটকে রাখা যাচ্ছে না। এই যে তিনটা দিক বললাম- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত ও ধর্মের ভিতরের ধারা-উপধারা এবং নারী, এর বাইরেও কুতথ্যটা ব্যাপক আকারে প্রসারিত হচ্ছে। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, কোভিড-১৯ এর সময়কাল থেকে কুতথ্যের প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

কুতথ্য ছড়ানোর সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কতটা?

শান্তনু মজুমদার : বেশিরভাগ কুতথ্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আমরা অনেক কন্টেন্ট দেখেছি, চীনাদের বিরুদ্ধে বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পিং হচ্ছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের কন্টেন্ট দেখলাম, মুসলিম বিদ্বেষী থিমগুলোতে কন্টেন্ট তৈরি করছে। এই যে বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব বা অনুপস্থিতিতে অবৈজ্ঞানিক গোঁড়ামিপূর্ণ কথা অনায়াসে অজস্র লোকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষী অনেক মানুষ রয়েছে, যারা এই ব্যাপারগুলো জনপ্রিয় করে ফেলছে তাদের অজান্তেই। বড বড় কর্পোরেট সেক্টরে বিজনেস ইন্টারেস্টে তথ্য ছড়ায় নানান কিছু করে, কখনো গুজব কখনো তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু যদি অনুসন্ধান করা হয় দেখা যাবে, তারা সত্য তথ্য প্রচার করছে না। এমনও হতে পারে তারা অর্ধসত্যকে সত্যের মতো করে প্রচার করছে। যার ফলে দেখা যায় বিভিন্ন যৌক্তিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

আপনি বলতে চাইছেন যে, কুতথ্যের কারণে আমরা সামগ্রিক চিত্র না দেখে খণ্ডিত চিত্র দেখি?

শান্তনু মজুমদার : অবশ্যই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে। একটা ছোটো উদাহরণ দিই, তৈরি পোশাকের মূল্য ডলারে কনর্ভাট করা নিয়ে আলোচনা করি। টাকা আয় বা ব্যয় এর মধ্যে শ্রমিকের মজুরি সংক্রান্ত আলোচনা খুব কম। এমনকি মিডিয়াতেও এমন কুতথ্য দেখি। আমরা অনেক সময় দেখি শ্রমিকরা কারখানাতে ঢিল ছুঁড়ে মারছে কিন্তু এর পেছনে কী বাস্তবতা আছে তা বুঝি না। শ্রমিকরা জানে পুলিশ আছে, আন্দোলন করলে তারা আক্রান্ত হতে পারে। সবকিছু জেনেই আহত বা নিহত হওয়ার আশঙ্কা জেনেও দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার কারণে তারা রাস্তায় নামে, আন্দোলন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মিডিয়াগুলো শুধু তাদের ঢিল ছোঁড়াটাই দেখাচ্ছে। তারা যে দু'মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছে না, সেটা নিয়ে কোনো নিউজ হচ্ছে না। সুতরাং আমরা সিনেমার শুধুমাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় পার্টটাই কেবল দেখছি।

ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও কী ব্যাপারটা একইরকমভাবে খাটে?

শান্তনু মজুমদার : হ্যাঁ। মতাদর্শের জায়গা, ঠিক বা বেঠিক, ইনসাফের জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো তো আসবেই। বোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমার মনে তো এই প্রশ্নটা আশা উচিত যে, এই শ্রমিকগুলো কি পাগল যে এরা রাস্তার মাঝে এইসব করছে। তাই এই জায়গায়টাই আমার মনে হয়েছে সবসময় রিউমার বা গুজব একটা ফর্ম। এই দিকগুলো থেকে মনে হয়েছে অন্তর্জালে কুতথ্যের যে মহাসাগর তার মাঝে আমরা যাতে তলিয়ে না যাই সেটা দেখা। এটা কিন্তু কোনো মেকানিক্যাল বিষয় না যে, কতগুলো 'সাইবার সিকিউরিটি' বুঝিয়ে দিলাম আর তাতে করে লোকটা খুব তাড়াতাড়ি এন্টি কুতথ্য পার্সন হয়ে যাবে।

দেশে ক্রমাগত শিক্ষিত মানুষ বাড়ছে, শিক্ষিত যুবক বাড়ছে। আবার এই শিক্ষিত যুবকরাই কুতথ্য তৈরিতে, ছড়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। 'শিক্ষিত' হবার পরেও জেনেশুনে তথ্যের সত্যতা যাচাই না করেই গুজব বা কুতথ্যে কান দিচ্ছে কেনো?

শান্তনু মজুমদার : শিক্ষিত হবার পরও মানুষ সমাজে পরিবর্তন বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে থাকবে, এমনটা আমি মনে করি না। কখনো কখনো শিক্ষিত ব্যক্তিও কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হতে পারে। আমি মনে করি ব্যক্তির বেসিক গঠনটা জরুরি। এটা সবসময় বলা যাবে না যে, সোশ্যাল ক্যাপিটাল বা সোশ্যাল পলিটিক্সের ওপরে তা অনেকখানি নির্ভর করে। একজন এসএসএসি পাস করেননি এমন মানুষও পিএইচডিধারী গবেষকের চেয়ে বেশি সমাজসচেতন, পরিবেশসচেতন, করোনা সচেতন হতেই পারেন। যার যত ডিগ্রি তিনি তত ভালো মানুষ বা সচেতন সমাজবন্ধের মানুষ আমি তা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, এর চেয়ে সহজ সমীকরণ আর নেই। ফলে এটুকু বলা যায় যে, যিনি কুতথ্যের শিকার বা বুঝে বা না বুঝে কুতথ্য ছড়ানো ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিতও হতে পারেন।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কি আছে?

শান্তনু মজুমদার : উত্তরণে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের বেসিকগুলো জানা দরকার। নারীবিদ্বেষ কেন? ধর্মের একটি ধারা আরেকটি ধারাকে কেনো নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়? আলটিমেটলি এটা জানাটা খুবই জরুরি যে, বাস্তবতাটা কী- এসবের ব্যাখ্যা কী। আমাদের মনে হয়, যে জায়গাটায় ঘাটতি হচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে সরে গিয়েছি আমরা। জানি, ৭৫-এর পটপরবর্তী ঘটনা। তার থেকে রেষারেষির সূত্রপাত। তরণদের মাঝে হতাশা,

ক্রোধ, রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যায় বা সরকারিভাবে অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। এখন কেউ আর সমাজের ফ্রেমে ভাবে না, ব্যক্তির ফ্রেমে ভাবে। বিভিন্ন উগ্রপন্থী দল তাদের অর্থ-সম্পদ বাংলাদেশের চিন্তা বিরোধী কাজে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ তো একটা চিন্তার নাম তাই না? বাংলাদেশের চিন্তার বিরোধী চিন্তা প্রবল করে তুলছে। তবে পৃথিবীজুড়ে কুতথ্যের যে জোয়ার বইতে চলছে এটাকে ঠিক দেশের ফ্রেমে দেখবার আর সুযোগ নেই।

আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।

শান্তনু মজুমদার : আইইডিকেও ধন্যবাদ।

'কুতথ্যে মানুষের চেয়ে বন্যপ্রাণীই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ'

শাহরিয়ার অনির্বান

সাংবাদিক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন

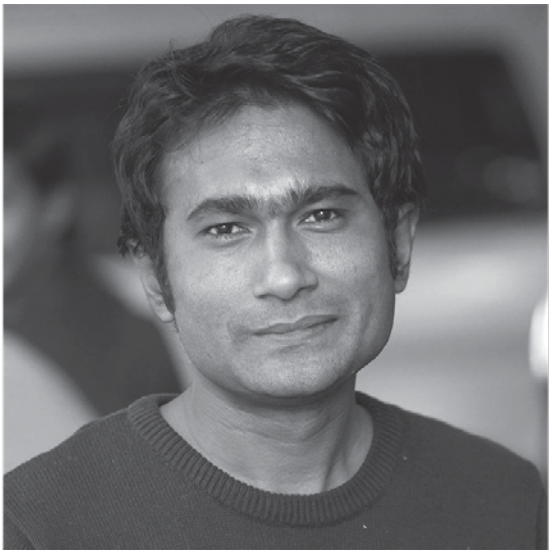

শাহরিয়ার অনির্বান এক দশক ধরে পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতায় যুক্ত। তিনি ঢাকায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে নিয়মিত লিখে থাকেন।

আপনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ সাংবাদিকতায় যুক্ত। কখনও দেখেছেন যে, গুজব, কুতথ্য বা অপপ্রচার ছড়িয়ে বন-জঙ্গল বা বন্যপ্রাণীদের উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ। বাংলাদেশে কুতথ্য বিভিন্নভাবে ছড়ায়। দেখেন, এই কুতথ্যগুলো সমাজে যেভাবে ছড়াচ্ছে সেখানে যেমন রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট থাকে পাশাপাশি লোকাল কিছু ইন্টারেস্টও এর সঙ্গে জড়িত। গুজব, কুতথ্য বা অপপ্রচার প্রভাব ফেলছে আমাদের রাজনীতির ওপরে, আমাদের প্রতিদিনের জীবনাচারের ওপরেও। ঠিক একইভাবে আমাদের বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশের উপরেও পড়ছে। গুজব বিশেষকরে ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য ব্যপকভাবে ছড়ানো হচ্ছে আমাদের শহর ও গ্রাম পর্যায়ে।

আপনি কী ধরণের দেখেছেন?

শাহরিয়ার অনির্বান : আপনাকে সাম্প্রতিক একটা ঘটনা যদি বলি। ২০২১ এর ডিসেম্বরের দিকে গাইবান্ধায় হঠাৎ করে খবর আসলো যে, ওখানে রাত হলে একটা অপরিচিত প্রাণীকে তারা দেখতে পাচ্ছে এবং গ্রামের পর গ্রাম, সেখানের মানুষজন, শিশু থেকে বয়স্করাও আক্রান্ত হচ্ছে। তো সেই প্রাণীটা আসলে কি, কোন প্রাণী তা জানা যাচ্ছে না, কেউ বলতে পারছেন না। কেউ বলছেন তার চোখ শিয়ালের মতো, কেউ বলছেন শরীর বাঘের মতো; বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা। শুরুতে হয়তো কেউ আক্রান্ত হয়েছে। এইরকম কথা যখন ছড়ায় পুরো গ্রামজুড়ে ছড়ানো হয়। কিন্তু ছড়ায় কীভাবে?

একটা কুকুরও যদি কামড় দেয়, সে কুকুরটা যদি অন্ধকারে লুকিয়ে চলে যায় অনেকে একটু ভয় থেকে ভেবে নেয় যে এটা অন্যকিছু মনে হয়। তারপর ওই আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে দেখা করতে আসে গ্রামের লোকজন। আসার পরে তখন ঘটনাটা আলোচনা পর্যালোচনা হয়। ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। তাহলে এটা কোন প্রাণী? তখন তারা দেখে আশেপাশে কুকুর আছে কি না? তখন কুকুরের উপরে মূল টার্গেটটা থাকে। লোকজন তখন ওই পুরো এলাকাজুড়ে একত্রিত হয়ে প্রথমে কুকুর নিধন শুরু করে। তারপরও হয়ত দেখা যায় কুকুর মারার পরও এরকম ঘটনা ঘটতেছে। তার মানে কুকুর না অন্য কোন প্রাণী এখানে আছে। তাহলে অন্য কোন প্রাণী? কিন্তু এটা তারা কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু এরকম আক্রান্ত হচ্ছে দু'একজনে, ঘটনা ঘটতেছে। তো এই ঘটনাগুলো যখন দিনের পর দিন জিইয়ে থাকে। অর্থাৎ আছে, আজকে হচ্ছে, কালকে হচ্ছে।

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিউজগুলো যাচ্ছে, তখনও কি তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না?

শাহরিয়ার অনির্বান : না। এই যে যখন এগুলো চাপা পড়তে থাকে, দিনের পর দিন যখন থমকে থাকে তখন তো গুজবের মাত্রাটা আরো বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ে গাইবান্ধায় যে ঘটনাটা ঘটলো, একজন নাকি এরকম প্রাণীর আক্রমণে মারাও গেলো। এরকম গুজবগুলো আছে। আসলে সে ওই প্রাণীর আক্রমণে মারা যায়নি, আগে অসুস্থ ছিলো তারপর সে আক্রান্ত হবার পরে আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে মারা যায়। এখন এক্ষেত্রে এরপর তিনমাস ওই এলাকায় অবস্থান করে বন বিভাগসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সবার সাথে কথাবার্তা বলে। তারা কনফার্ম হলো যে সেটা হচ্ছে শিয়াল। অর্থাৎ ওখানে প্রচুর পরিমাণে শিয়াল বেড়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে খাবারের সন্ধানে তারা বাড়িঘরে হানা দিচ্ছে, হয়ত সেইসময় তাদের মানুষের সাথে সংঘাতগুলো লাগছে। তো এই গেলো সাম্প্রতিক ঘটনা।

এরকম ঘটনাগুলো এলাকায় যখন ঘটে তখন ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ঘটে তখন কয়েকটা ক্ষতি হয়। মানুষের ভেতরে একটা ভীতি কাজ করে এবং সে ভীতিটার বিভিন্ন রকমের সুযোগ নেয় ভিলেজ পলিটিকস বা স্থানীয় যারা পলিটিশিয়ান আছে তারা।

ভিলেজ পলিটিক্সটা কেমন?

যেমন ধরেন একটা ঘটনা একবার ঘটেছিলো সেটা হচ্ছে, প্রায় বছর দশেক আগে হবে। এটা শ্যামনগর। সেখানে খবরটা আসলো এরকম যে, এলাকায় বাঘ এসেছে। তো বাঘের পায়ের ছাপ কেউ দেখে নাই কিন্তু বাঘ এসেছে। কেউ দেখেছে বাঘ। এরপরে একদিন বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেলো। এরপরে আরেকজনকে পাওয়া গেলো তার বাছুর নিয়ে গেছে। বাছুরকে আক্রমণ করতে গেছে তখন সবাই মিলে সেটা প্রোটেক্ট করেছে। পরে বোঝা গেলো সেখানে একটা বাঘ আছে কিন্তু বাঘটা ধরা যাচ্ছে না। কেউ ধরতে পারছে না বা উদ্ধার করতে পারছে না। এই সুযোগে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিনই প্রায় এর ওর গোয়াল থেকে বাছুর তারপর গরু এগুলো হারিয়ে যায়, নাই হয়ে যাচ্ছে। তখন ধরে নেয়া হয় যে, এটা বাঘ নিয়ে যাচ্ছে। বাঘ একটা গরু বা একটা ছাগল যদি নিয়ে যায় তো মিনিমাম সে ঐ খাবারটা একদিন খাওয়ার পরেও অন্তত পক্ষে সে দুই-তিনদিন অন্য কোন শিকারের দিকে যায় না। ওটাই হজম করে ওটাই খায়। তো এখানে যখন দেখা যাচ্ছে যে, একদিন পর পর এরকম ঘটনাগুলো ঘটছে তখন অনুসন্ধানে জানা গেলো যে, বাঘ এসেছে ঠিক আছে কিন্তু এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে স্থানীয় বেশ কিছ লোক। তারা যাদের যাদের উপরে হয়তো ব্যাক্তিগত রেষারেষি আছে সেসব বাড়িতে গিয়ে তারা রাতের আঁধারে লুটপাট করে নিয়ে বা গরু ছাগল নিয়ে আসছে। দোষ দেয়া হচ্ছে বাঘের। এরকম ঘটনা কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে সবথেকে ম্যাসিভ আকারে ঘটে। এই যে ভুল তথ্য। পরে বাঘকে পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজন মিলে এসে তাকে মেরে ফেলেছিলো।

গাইবান্ধার ঘটনাটায় আবার আসি। গাইবান্ধার ঘটনায় এই তিনমাসে লোকজন একটা ভীতিকর অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছে এবং এই তিনমাসে ঐ এলাকায় যাচ্ছেতাইভাবে বনবিড়াল মারা হয়েছে, কুকুর মারা হচ্ছিল তারপর শেয়াল যেখানে পাওয়া যাচ্ছিলো সেখানেই মারা হচ্ছিলো। এই যে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করে ওই এলাকাকে সুনসান করে দেয়া এগুলোর মূল কারণই কিন্তু হচ্ছে গুজব এবং মিথ্যা তথ্য। আমরা যদি শুরুতেই যখন একটা ঘটনা ওই এলাকায় ঘটছে তখনই যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি অপরিচিত প্রাণী বলে বাংলাদেশে তো এখন কোন প্রাণী নাই। মানে যাই আছে লোকালয়ে বিশেষ করে লোকালয়ের

আশেপাশে সেসব কিন্তু আমাদের পরিচিত, আমরা চিনি। তো অপরিচিত শব্দটা যখনই ব্যবহার করা হয় তখনই মানুষের ভিতরে আতঙ্কটা আরো বেশি তৈরি হয়। এই অপরিচিত শব্দটা মিথ্যা তথ্যের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয় স্থানীয়ভাবে সুযোগগুলো নেয়ার জন্য।

আপনি বলছেন যে স্থানীয়, কিন্তু আপনি এরকম দেখছেন যে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকসময় এধরনের কুতথ্য ছড়ানো হয়েছে?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ। দেখেন কচ্ছপের মাংস কিন্তু দেশের মানুষের একটা অংশ খাচ্ছে এবং বিদেশেও কচ্ছপের মাংসের ব্যপক রকমের চাহিদা আছে। আর একসময় বাংলাদেশে কচ্ছপ জলাশয়গুলোতে খুব সয়লাব ছিলো। তখন এটা এভাবে ছড়ানো হলো যে, এটি থাকলে জলাশয়ের মাছ শেষ হয়ে যায়। তখন মুসলিম যারা বা মুসলিম সম্প্রদায়ের যারা তারা কিন্তু এই কচ্ছপ সমানে ধরে মারা শুরু করলো। এখন মেরে তারা তো খায় না, তারা এখন কী করবে এটা তারা তখন একটা শ্রেণির ওই ব্যবসায়ী শ্রেণির ভিতরে ঢুকল। ওই এলাকায় ঢুকে তখন তাদের যে দালাল আছে তারা তখন বলে যে ঠিক আছে আমি তোমার পুকুরের, জলাশয় বা বিলের কচ্ছপ সবগুলো ধরে নিয়ে আসো আমি সবগুলো কেজি দরে কিনে নিচ্ছি। এভাবে কিন্তু বিজনেসটা চলছে এবং এটি এভাবে চলছে।

সাপের ক্ষেত্রেও কী এরকম হয়?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ, সাপের ক্ষেত্রেও এটা হয়। আরেকটা বিষয় আপনাকে বলি, আমাদের নড়াইল এবং সুন্দরবন এলাকার যে ভোঁদড়। ভোঁদড় হচ্ছে আমাদের এই এলাকার একদম স্থানীয় একটা প্রাণী। এটি সুন্দরবন এলাকার ওইপাশে ফরিদপুর এবং নড়াইলে পুরো এলাকার জলাশয়জুড়ে কিন্তু ভোঁদড় ব্যপক রকমের ছিলো। ওরা থাকেও কিন্তু নদীর পাড়ে। তো এখন এই ভোঁদড় কিন্তু বর্তমানে এখন বাংলাদেশে নাই বললেই চলে, বিলীন হয়ে গেছে। লাল তালিকায় বর্তমানে। এই ভোঁদড়ের কিন্তু বিদেশে ব্যপক রকমের চাহিদা আছে, বিশেষ করে ভারত এবং ইউরোপে। ওদের মাংস খব সুস্বাদু, এটি খায় এবং সেই সাথে মাছ শিকারেও ভোঁদড়কে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে যেটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে কচ্ছপের মত এই ভোঁদড় নিয়েও একটা গুজব আছে। যে পুকুরে ভোঁদড় যাওয়া আসা করে সেখানে, সে পুকুরে মাছ থাকে না। ভোঁদড় মাছ খেয়ে ফেলে। তো তখন এই মুসলিম বা একটা সম্প্রদায় এই ভোঁদড়গুলোকে ঐ এলাকা থেকে সরানো শুরু করে। যেহেতু ভোঁদড়ের বিদেশে চাহিদা আছে তখন একটা ব্যবসায়ী শ্রেণি সেখানে ঢোকে। তারা সেখানের ভোঁদড় তাদের কাছ থেকে নিয়ে পাচার করে

দিচ্ছে।

আপনি খুব চমৎকার উদাহরণগুলো দিয়েছেন। এগুলো যে ঘটছে তা কি সরকারের অগোচরে একেবারে?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ। এগুলো সবকিছুই সরকারের অগোচরে হচ্ছে। এমনকি সরকার জানেও না। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন-২০১৮তে পাশ হলো তো। এর আগে যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ বঙ্গবন্ধুর সময়ে যেটা ছিলো এটি খুবই দুর্বল ছিলো এবং সেটার কার্যক্রম বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও খুব বেশি উদার ছিলো না সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো। ইদানীং ২০১৮ এর পর থেকে এটা খুব শক্ত, তৎপরতা তাদের আছে। তাদের বেশ কিছু ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট তারা গঠন করছে, যেটা বন্য প্রাণী পাচার বন্ধে তাদের নজরদারিতে রাখে। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন বিশেষ করে আমাদের দেশের বন্য প্রাণীগুলো পাচার হয় হচ্ছে সমুদ্রপথ এবং আমাদের সাতক্ষীরা অঞ্চলটা দিয়ে। এই অঞ্চলগুলোতে এরা তখন যোগাযোগটা খুব ভালো রাখে এবং সেখানকার বিজিবি বা স্থানীয় প্রশাসন কোনকিছু ঘটলে সাথে সাথে ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরেও এই ক্যাপচারের সংখ্যাটা বাংলাদেশে ২০% হচ্ছে বাকি ৮০% পাচার অগোচরে হয়ে যাচ্ছে। এখানে সক্রিয়ভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক আশ্রয়ে যারা আছে তারা এটির সাথে সরাসরি যুক্ত।

এই পাচারটা করছে কীভাবে? বন্দর দিয়ে না বর্ডার দিয়ে?

শাহরিয়ার অনির্বান : এটা বর্ডার দিয়ে পাস হচ্ছে ও পোর্ট দিয়েও হয়। আমাদের এখানে পাচারের জন্য সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বর্ডার সাতক্ষীরা এবং শেরপুর। শেরপুরে যেটা ফেল করে সেটা সাতক্ষীরা থেকে পার হয়। সাতক্ষীরা থেকে যেগুলো পার হয় সেগুলোর খুব অল্প সংখ্যক এখন বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরা ধরতে পারে। গত বছরে বেশকিছু পাটাগোনিয়ান মারা হয়, হল্যান্ড থেকে যেটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটা।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, যা ঘটছে এখানে, বাংলাদেশে এই গুজব ছড়িয়ে বা কুতথ্য ছড়িয়ে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে তা প্রতিরোধে সরকারি বেসরকারি কোন উদ্যোগ কী এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি?

শাহরিয়ার অনির্বান : উদ্যোগ আছে। উদ্যোগ আছে বলতে কি মানুষ এখন অনেক সচেতন হচ্ছে, ধরেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো শুরু করে মিডিয়া বা

টেলিভিশন সবগুলোতেই এখন এবং বন্যপ্রাণী যে পাচার করা যাবে না এরা আমাদের পরিবেশের জন্য সহযোগী এবং এটা হারায়ে ফেললে যে আমাদের অস্তিত্ব নাই হয়ে যাবে এই বিষয়টা প্রচারণার ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, এনজিও রয়েছে বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। তারা কিন্তু এলাকাজুড়ে বিশেষ করে বন্যপ্রাণী নিয়ে পজেটিভ তথ্যগুলো মানুষের কাছে দিতে চেষ্টা করছে এখন।

আরেকটা বিষয় আছে যে, অনেক রাতে একটা পাখি ডাকে কু পাখি নামে আমরা বলে থাকি। এই কু পাখি যদি কোন বাড়িতে ডাকে তাহলে আমরা ধরে নেই যে, পরেরদিন ওই বাড়িতে অশুভ কিছু হবে। মারা যাবে বা এই ধরনের কিছু হবে। তো সাথে সাথে তখন ওই বাড়ির লোকজন খুঁজতে থাকে ঐ কু পাখিটা কোথায় এবং তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এটাতো ধরেন গ্রামের গল্পটা বললাম।

ধর্মীয়ভাবে কি এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ। গ্রামে তো মসজিদে বিশেষ করে শুক্রবারে নামাজে সবাই জমায়েত হয়। জুম্মার নামাজে লোকজন বেশি হয়। খুতবা পাঠের সাথে সেই সময়টায় এই বন্যপ্রাণী আমাদের জন্য কতখানি সহায়ক এই বিষয়গুলো, গল্পগুলো কিন্তু বলার জন্য তাদের বলা হয়েছে। জানি না বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় এটা হয় কি না। তবে কিছু কিছু জায়গায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু মসজিদব্যাপী এরকম হচ্ছে না। মাঝখানে একজন ইমামের সাথে আমার কথা হচ্ছিল সেটা প্রায় বছর দুয়েক আগে মনে হয়। রংপুরের এক ইমামের সাথে। আমি সিটি কর্পোরেশন কাভার করতে গেছি তখন। রাত্রে আমি যে বাড়িতে আছি, সে বাড়িতে এরকম কু পাখি ডাকছে। তো গল্প করছি এক ইমামের সাথে। তিনি ছিলেন নিচে চা দোকানে। উনাকে বললাম যে চাচা এই যে কু পাখি ডাকছে, এতে তো অনেক খারাপ কিছু হয়ে যাবে মনে হয়। তো উনি বললেন, না এটা ভুল কথা। দেখুন পৃথিবীর কোন প্রাণী সৃষ্টিকর্তা বিনা প্রয়োজনে তৈরি করে নাই। প্রতিটা প্রাণী তৈরি করার পিছনে কারণ আছে। এবং অবশ্যই এই জায়গাটায় উপকার কিছু আছে। তো কু পাখি যে ডাকছে সেটা খারাপ কিছুর সংকেত না, সে আল্লাহর ইবাদত করতেছে। তার এই যে ম্যাসেজটা এটা আমার খুব পজেটিভ মনে হয়েছে। আমি বললাম যে, আপনার কথাটা আমার খুব ভালো লাগছে। আপনি কী এটা গ্রামের সবাইকে বলেন? সে বলে হ্যাঁ, আমি সুযোগ পাইলে বিভিন্ন মিলাদে আমি বলি। তারপর মসজিদে যখন খুতবা পড়া হয়, ঠিক সেসময় আমি মাঝে মধ্যে আমি এগুলো বলি। সে হয়তো এটা ভালোবাসে বলে বলছে। কিন্তু এটা যদি পার্সেন্টেজেড হিসেবে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে এটা মাইনাস পার্সেন্টেজ, খুব

রেয়ার। আসলে এই পর্যায় পর্যন্ত যাওয়া লাগবে।এখন যদি বিশেষ করে মসজিদ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো যারা আছে তারা যদি জমায়েত হয় সেই জায়গাগুলোতে মাস পাবলিকের কাছে বন্যপ্রাণী সহায়ক বা সম্পর্কিত পজেটিভ যে বার্তা তার ম্যাসিভ কার্যক্রমটা এখনো শুরু হয়নি। তবে বনবিভাগের পক্ষ থেকে বেশ কিছু ক্যাম্পেইন ওরা করতেছে।

বনবিভাগের কী ধরনের ক্যাম্পেইন চোখে পড়েছে আপনার?

শাহরিয়ার অনির্বান : ঢাকায় করছে, ঢাকার বাইরেও তারা করছে। তবে সেটা সামাজিক ভাবে খুব বেশি কার্যকর না, যদি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর প্রচার না হয়। গণমাধ্যম মানুষের কাছে খুব এক্সক্লুসিভলি যাচ্ছে। তারপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুব ক্লোজ হয়ে গেছে। তবে বিভিন্ন এনজিও যারা রয়েছে, তারা আমাদের বিভিন্ন বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য যে দিবসগুলো রয়েছে যেমন, বাঘ দিবস, ব্যাঙ দিবস, সাপ দিবস পালন করে। সেসময় কিন্তু তারা বিভিন্ন রকমের লিফলেট বিতরণ করছে, বিভিন্ন প্রকারের ক্যাম্পেইন করছে। সবাইকে বুঝাচ্ছে যে আসলে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এইযে ম্যাসেজগুলো তা কিন্তু স্কুল পর্যায় পর্যন্ত যেতে হবে। এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় বাংলাদেশের সরকার বা বনবিভাগ কভার করতে পারে।

বিশেষ করে আমাদের ক্রিকেট টিমটা। আমাদের ক্রিকেট টিমের সিম্বল হচ্ছে টাইগার। তো সারা পৃথিবীতে যখন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ক্রিকেট খেলতে যায় তখন আমরা কমেন্ট্রিতেও শুনি যে, টাইগাররা এত রান করেছে, টাইগাররা জিতেছে, টাইগাররা আজকে হেরেছে। তো যখন আমাদের সবার প্রিয় একটা দল টাইগার নিয়ে হয়। এই বাঘ নিয়ে বা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আমাদের ক্রিকেটারদের নিয়ে ব্যবহার করা, সরকারিভাবে ব্যবহার করা বা আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে কাজে লাগানো। এই জায়গাগুলোতে যদি কাজ করা হয় তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি যায়।

ক্রিকেটাররা কীভাবে ক্যাম্পেইন করবে তাহলে?

শাহরিয়ার অনির্বান : সুন্দরবন বিধৌত এলাকা থেকে উঠে আসা সাকিব, মাশরাফি, মোস্তাফিজ এই ছেলেরা হচ্ছে আমাদের দেশের, বাংলাদেশের আইকন। এখন সুন্দরবনের বাঘ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য তারকারা যদি স্কুলে বা বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে যদি বলে তাহলে উপকার হয়। সেই কথাটি ওই যে বাঘ শিকার করছে সুন্দরবনের লোকটা, তার ছেলে স্কুল থেকে শুনে আসলো মাশরাফি বলছে, বাঘ

মারা যাবে না ও কিন্তু বাড়িতে এসে তার বাবাকে বলবে,বাবা তুমি বাঘ মাইরো না, তুমি এই প্রাণীটা মাইরো না। এই যে একটা সেতুবন্ধন তেরি করার ক্ষেত্রে এই তারকাদের ব্যবহার করা উচিত। এটি কিন্তু ভারতে ব্যবহার করেছে। এছাড়া পৃথিবীতে অনেক দেশে করছে কিন্তু বাংলাদেশ এখনো যেতে পারে নাই। আমরা সবাইতো তারকাদের ভালবাসি, যার কারণে এদের ব্যবহার করা উচিত। আর বিশেষ করে এই গুজব এবং মিথ্যা তথ্য এইকথাগুলো চরমভাবে আমাদের বন্যপ্রাণীর উপরে প্রভাব পড়ে।

কাছিম-ডলফিন নিয়েও তো গুজব শোনা গিয়েছিল?

শাহরিয়ার অনির্বান : হ্যাঁ। সামুদ্রিক বিশেষ করে কক্সবাজার সোনাদিয়া ও মহেশখালিতে প্রত্যেক বছর এই সময়ে প্রচুর সামুদ্রিক কাছিম আসে। অলিভ টার্টেল যেটাকে বলা হয়। ডিম পাড়ার জন্য আসে। এই যে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসে, আসার সময় ও ডিম পেড়ে যাওয়ার পথে পুরো এই জার্নিটার ভেতরে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। এই ঝুঁকিতে পড়ে তারা যখন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ঢুকে পড়ে। তখন আমাদের গভীর সমুদ্রে মাছ মারা হয়। সে সময় মাছ মারার সময় জালের, ফাসাজালের মধ্যে কচ্ছপগুলো আটকে যায়। তো জেলেদের কিন্তু একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যদি কচ্ছপ কোন জালে আটকায় তাহলে ওই জালে ওইদিন আর মাছ উঠে না। এরকম একটা মিথ একটা ভ্রান্ত মিথ তাদের ভিতরে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। তাই জালে কোন কচ্ছপ আটকা পড়লে কাঁচি দিইয়ে গলা কেটে খুব নির্মমভাবে এই সামুদ্রিক কাছিমকে মেরে ফেলা হয়। এমনও দেখা যায় যে ডিম পেড়ে হয়তো ফিরছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে হয়তো যে কাছিমটা এসেছে ডিম পেড়ে বাংলাদেশ থেকে সোনাদিয়া হয়ে আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু যাওয়ার সময় সে নির্মমতার শিকার হলো।

এই ঘটনাগুলো তো সমুদ্রে যারা জেলে, যারা মাছ মারতে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে ডলফিন। ডলফিনের ক্ষেত্রে একটা বলি, আমাদের ডলফিন মারা যাওয়ার, উদ্ধারের ঘটনাগুলো ঘটছে। আমাদের মিঠা পানির ডলফিন, সমুদ্রের নতুন এক ডলফিন এই ডলফিনগুলো যখন আমাদের জেলেদের জালে আটকা পড়ে তখন তাদের ভিতরেও এই গুজবগুলো আছে যে, ডলফিন আটকালে মাছ পাওয়া যায় না। তখন তারা ডলফিন মেরে ফেলে। এক্ষেত্রে ডলফিন মেরে ফেলার পিছনে আরেকটা খুব ব্যবসায়ী চিন্তা ভাবনা আছে। যেমন ডলফিনের তেল খুব দামি। যার কারণে তারা ডলফিনটা তুলে যারা তেল বিক্রেতা আছে বা যারা কেনে যারা তারা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে এগুলো বিক্রি করে।এটা বন্যপ্রাণী হারিয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যতম। অর্থাৎ বলবো সচেতনতার পাশাপাশি এই যে মিথগুলি ও গুজব

বা মিথ্যাতথ্য এইগুলি অন্যতম দায়ী। যেটা আজ বছরের পর বছর সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে, চলে আসছে তখন মানুষ গিয়ে এদের মারছে এবং তাদের শেষ করে ফেলা হচ্ছে।

গুজবের সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাথমিক স্তরে কারা ছিলো ?

শাহরিয়ার অনির্বান : বানর, বানর মানুষের পাশাপাশি সহঅবস্থানে ছিলো। যখন বানরের এলাকায় মানুষ বসতি স্থাপন করে ফেললো তখন মানুষ বানরকে উচ্ছেদ করে দেয়। তারপর থেকে বিভিন্ন রকমের গল্প ছড়ানো হলো বানর নিয়ে। এইযে ভুল তথ্য মানে আমার কাছে তো মনে হয় যে, গুজবে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাথমিক স্তরে মানুষের থেকে আমার মনে হয় বন্যপ্রাণীরাই হবে। এরাই সবথেকে বেশি ভুলতথ্যের শিকার হচ্ছে এবং অস্তিত্ব সংকটে চলে যাচ্ছে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

শাহরিয়ার অনির্বান : আইইডিকেও ধন্যবাদ।

সহায়ক গ্রন্থ, সাময়িকী, পত্রিকা, জার্নাল, ওয়েবসাইট লিংক

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র, সুশাসন ও তথ্য অধিকার; রোবায়েত ফেরদৌস, দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261.html

The Forest Act 1927 (Act XVI of 19270)

eb¨cÖvYx AvBb 2010

https://en.wikipedia.org/wiki/Disinformation

Global investigative journalism network|| https://gijn.org/

https://bn.wikipedia.org/wiki/¸Re

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_manipulation

গুজবের অর্থনীতি, অজয় দাশগুপ্ত, সময় প্রকাশন, ২০২০

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য প্রতিরোধে প্রথাগত নাগরিক সমাজের করণীয়, আইইডি, ২০২১

নেত্রকোনার লোকায়ত গল্প গুজব, গোলাম এরশাদুর রহমান, নেত্রকোনা বাউল সমিতি, ২০০৫

Rationale for a Relationship between Media Freedom and the Process of Democratization, Robaet Ferdous & Sheikh Mohammad Shafiul Islam, Social Science Review, The Dhaka University Studies, Part-D, Volume 30, Number 2, December 2013

Book of Lies: The Disinformation Guide to Magick and the Occult, by Richard Metzger, 2004

Everything You Know Is Wrong: The Disinformation Guide to Secrets and Lies, by Russ Kick, 2002

Bullspotting: Finding Facts in the Age of Misinformation, Lorren Collins, 2004

The Misinformation Age: How False Beliefs Spread, James Owen Weatherall, 2004

Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare by Thomas Rid, 2009
Finding Facts in a World of Disinformation by Brooks Jackson and Kathleen Hall Jamieson, 2007
Democracy in the Disinformation Age: Influence and Activism in American Politics by Regina Luttrell, Lu Xiao, Jon Glass 2021
Counterintelligence as Disinformation Operations", The Oxford Handbook of National Security Intelligence, Oxford Handbooks, Oxford University Press, Johnson, Loch K. Ed. 2012
Countering Russian Disinformation, McGeehan, Timothy P, Parameters, 2018.
A Powerful Russian Weapon: The Spread of False Stories, The New York Times, Mac Farquharaug, Neil 28 August 2016
গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও তৃণমূল মানুষের তথ্য-অধিকার, রোবায়েত ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জানুয়ারি ২০০৮
"Fake news is not new: Russia's 19th-century disinformation experiment". OUPblog. 1 May 2021.
The danger of Russian disinformation", The Washington Post, Anne Applebaum; Edward Lucas, 6 May 2016
Rumor and Public Opinion, The American Journal of Sociology, Peterson, Warren; Gist, Noel, 1951
Oxford English Dictionary, 2nd ed., 1989
'Parbatya Chattagram Jana Shanhati Somity (PCJSS)' (in Bengali), PCJSS is the main political organization of the ethnic minorities in the South-Eastern Hill tracts area of Bangladesh, Dr Shantau Majumder, Banglapedia, Bengali Encyclopedia, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003
David Coast and Jo Fox, "Rumour and Politics" History Compass (2015)
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE/a-54566443

https://www.dw.com/bn/%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE/a-54566443
বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা, রোবায়েত ফেরদৌস ও ফিরোজ জামান চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, আগস্ট ২০০৯

বাংলাদেশের জনজীবন ও পরিবেশে

কৃতথ্যের কথকতা

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
সিয়াম সারোয়ার জামিল

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)